প্রথম প্রকাশ : ১ বৈশাখ ১৩৫৯

প্রকাশক

সুরজিৎ ঘোষ

প্রমা প্রকাশনী। ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ

কলকাতা-১৭

মুদ্রক

বিশ্বনাথ পাত্র

সত্যনারায়ণ প্রেস। ১ রমাপ্রসাদ রায় লেন

কলকাতা-৬

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ

রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

৭।১ বিধান সরণী | কলকাতা-৬

সূচি

পৃষ্ঠা

যৌবনবাউল

বিভাব কবিতা (পটভূমিকা অন্ধকার আপন স্বত্ব অধিকার) ১৭
বুধুয়ার পাখি (জানো এটা কার বাড়ি ? শহুরে বাবুরা ছিলো কাল,) ১৮
অরণ্যমধু (এখানে ওদের কয়েকদিনের ডেরা,) ১৮
দেবযান (গাঁয়ের মহিম আর চড়কের মেলায় যাবে না,) ১৯
তিন দরোজায় (আশার দুয়ারে কড়া নেড়ে-নেড়ে দিন তো) ২০
বিষাদবৃক্ষ (বনবিজয়িনী এই বৃক্ষের বাসরে) ২০
নামখোদাই (এই যে ঘুমনিবিড় মাঠ, মুখরা এই নদী) ২১
অবিনশ্বর ('পঙ্কশয়ন ছেড়ে আজো যারা ওঠে,) ২২
একটি হাঁসের রাজ্য (আশ্চর্য, আমার ইচ্ছা তবু অন্তহীন—) ২৩
অন্ধ বাউল (আয় তাকে মন করবি চুরি,) ২৩
গোধূলির শান্তিনিকেতন (ব্যথায় শুকনো খোয়াইয়ের বুক চিরে) ২৫
আমার ঠাকুমা (বীতনিদ্র পিতামহ ছিয়াশীর কোঠা ছুঁয়েছেন) ২৫
পরাণ আমার স্রোতের দীয়া (আছে, একটি কথা আছে,···) ২৭
বসুধারা কল্যাণের ব্রতে (আবার এখন আমি শতকের জতুগৃহদাহ) ২৮
মুক্তধারা (তোমার মনের গভীর অরণ্যে) ৩০
কল্যাণেশ্বরীর হাট (প্রসন্ন প্রদীপ জেলে ব'সে আছে ঝমরুর প্রণয়ী ;) ৩১
অনন্ত মুহূর্ত (ওকে তুমি দাঁড় করিয়ে রেখো না, জানি তোমার) ৩২
দুটি হাসি (উজ্জ্বল তোমার হাসি, দুর্লভ উপমা।) ৩২
কৃশ বেদনার সাধনা (হাওয়ার ভিতরে কার ক্ষমা ঐ কাজ করে যায় ;) ৩৩
হাটের পরে (ভাঙা হাঁড়ি, কুনো কুঁজো—জল নেই। এপাশে দাঁড়িয়ে) ৩৪
মন্দ্রসপ্তক (একটি দীপ এখনো জলে, নিভিয়ে দাও তাকে,) ৩৫
অপূর্ণ (দ্বিতীয় ভুবন রচনার অধিকার) ৩৬
বুদ্ধপূর্ণিমার রাত্রে (সুগত, এ-জন্মে আমি কেউ না তোমার।) ৩৭
জনান্তিকে (হর্লাঝুরির শীর্ণ সাঁকোর আড়ালে) ৩৯
রাজসাক্ষী (আমার বাড়ির জন্য জমিটা কোথায়) ৪০
সূর্যমুখী নারী (সূর্যেরও আর তারুণ্য নেই, কে যেন তার দীপ্তি কেড়ে নিল,) ৪১
তমসো মা (দেখেছি সে-এক অন্ধ ধানক্ষেতে সারারাত্রি ঘুরে) ৪২
মায়ের জন্মদিনে (আনত্র প্রণতি আঁকি।) ৪৪
নির্জন দিনপঞ্জী (আকাশ জেনেছে, মাটিও শুনেছে আমি-যে করেছি···) ৪৫
বন্ধুরা বিদ্রূপ করে (বন্ধুরা বিদ্রূপ করে তোমাকে বিশ্বাস করি ব'লে ;) ৫১
পটভূমি (গ্রাম থেকে এসেছে সোজা যে-ছেলেটি নিমাই-সন্ন্যাসে) ৫২

বটের বদলে বকুলগাছের জবানবন্দী (চলত স্নিগ্ধ, নীলচে সবুজ মার্বেলে তার) ৫৩
শিশুমহল (ও শিশুমহিলা, আমি এ-পার্কে তোমায় প্রতিদিনই) ৫৪
অমৃতরূপা (আমি তাকে শহরের উপকণ্ঠী আকাশের দিকে) ৫৪
সোনার বাংলা (মা তোমার চোখে বিদ্যুৎ যদি ঝলে,) ৫৬
রুমানিয় একটি দম্পতি (সত্যি কি অতটা সুখী, বাইরে যতখানি) ৫৭
সুস্থ যন্ত্রণা (ধ্রুপদী দুঃখের পাহাড়ে বোসো,) ৫৮
মেয়েটি (দ্রুতপায়ে যে-মেয়েটি ভিড়ের ভিতরে মিশে গেল,) ৫৯
পথে-বিপথে ('শহরতলিতে এই ক'বছর আছ তো অলোক,) ৬০
ফিরোজাবাদ স্টেশন থেকে (স্বচ্ছ এই শালিখের মতো) ৬১
মানবী মাধবী এক মানুষের কাছে (আমার স্বপ্নের মধ্যে পাশের বাড়ীর···) ৬৩
প্রবর্তক (কী মেঘ দেখালে নিজে মেঘের আড়ালে ব'সে,) ৬৪
যদিও মৃন্ময় সবি (কালো ছায়া, দুই দণ্ড তিন দণ্ড দাঁড়াও চৌকাঠে) ৬৪
কল্লান্ত (আরো হয়তো রাত্রি হবে। তুমি এই নীল নভে) ৬৪
এ-বাসনা বোধিসত্ত্ব (আমি হই অনুধ্যানী অশ্বত্থের মত মগ্নব্রতী) ৬৫
সাড়া (আশ্বিনের আকাশতলে তোমায় কী যে বলেছিলাম) ৬৬
মানুষ (আমার ঘরের আলো আমার টগরগাছের ডগায়) ৬৭
গিরিমাটির দেশে (ও গাঁয়ের লোক বলে সে এখনো পথের মাঝখানে।) ৬৮
তুলসীতলা (কি করে যে অতটুকু ঘরের মধ্যে আছ !) ৬৯
আমি তো বুঝিনি (বৃষ্টি ঝিকিয়ে উঠল, বৃষ্টি রোদ্দুর রেখে দিয়ে) ৬৯
শেষের প্রহর (স্বপন ॥ একদিন তোমায় বলেছিলাম) ৭০
দূরবীক্ষণ (অন্য আলোয় আমাকে দেখবে তুমি।) ৭৪
একজন মৌলভী আমাকে (এ যেন গুল্মের ডাল, আর আমি একটি বউল,) ৭৫
সতীর্থ (ধীরোদাত্ত যাকে বল সেরকম এরা কেউ নয়,) ৭৬
একটি শবযাত্রা (স্পষ্ট আমি বলতে পারি ঐ) ৭৭
তিতিক্ষা (এইখানে দাঁড়িয়ে থাকো, এই অনুষঙ্গিনী কুয়াশা,) ৭৭
কী বলতে হবে, কী করে বলতে হবে (কী বলতে হবে,···) ৭৯
আবহমান (একদিন হেমন্তের ভোর ভেঙে গেলে) ৮০
চিহ্ন (সারাটা পৃথিবী তুমি রেখে গেছ স্মৃতিচিহ্ন করে ;) ৮১
জড়িত গোলাপ জড়িত বকুল (অযুত কেন্দ্রমন্দ্রস্বর ঘরে-প্রাঙ্গণে বাজে,) ৮২
স্বর্ণমুষ্টি (ডান হাতে এক মুঠি ছাই) ৮৩
গোধূলিতে চিন্ময়ের এক প্রতারণা (একটি আকাশ থেকে আরো এক···) ৮৪
ঘর (ওধারে মানুষেরা কী যেন চায়, হঠাৎ আয়োজন ভাঙে,) ৮৫
এক উদাসীন পান্থ (অন্ধকার থেকে অন্ধকারে) ৮৬
প্রতিবেদন (কে জানে আমার চেয়ে আরো স্বচ্ছ করে ?) ৮৭
আত্মা (পুরনো বটের ছায়া ভালো, কিন্তু কতদূর ভালো ?) ৮৮
ডাকটিকিটে বিপিন পালের মুখ (আমি আমার ভালোবাসা পাঠিয়েছিলাম···) ৮৯

পান্থশালা : নীলকণ্ঠপুর (এখুনি লণ্ঠন জ্বলবে। নিভবে রোদ্দুর।) ৮৯
তোমার প্রেমিক (সমস্ত ঘর ভিতর থেকে বন্ধ,) ৯০
আমার বাড়ির বয়স (কবে প্রথম কার কাছে এই মাটি) ৯০
ঘুম (আবার কখন ঝড়ের শেষে নিজের শরীর ফিরে পাওয়া—) ৯১
বধূটি স্বগত (কখন আসবে ঠিক বলতে পারি না,) ৯৩
হাওড়া স্টেশনে (বউটি লজ্জায় চমকে দীঘল ঘোমটা) ৯৩
এক-জানালা-রাত্রি আমার (এক-জানালা-রাত্রি আমার কাটল কেমন করে ;) ৯৪
যাত্রী (ভিতরদেহলি থেকে পথ গেছে দিগন্তের পানে,) ৯৪
স্বকীয়া (কী করে মুখ তুলতে অমন চোখের পাপড়ি বোজা,) ৯৬
মৌল কণ্ঠ (মৌল কণ্ঠ কেঁদে উঠল পথের অন্ধকারে ;) ৯৭
কালান্তর (বৃষ্টিতে কখনো তুমি একলা যাবে না বলেছিলে।) ৯৭
আমার ছায়া (যেন আমার ছায়া পড়ে) ৯৮
মেঘের মাথুর (দুটি মেঘ ছিল দম্পতিচুম্বনে,) ৯৯
ওরে ও চপল (ওরে ও চপল, তুমি ভয় পেয়ে চমকে উঠলে) ১০০
গ্রন্থি (পিছনে-পিছনে কারা আসে ;) ১০১
সূত্রধার (রুগ্ন শীর্ণ,) ১০১
আবার জীবন (এক হাজার বছর পর জান্‌লা খুলে দেখলাম আমার টগর···) ১০২
তোমার আমার দুঃখ বালির পাহাড় (কে তুমি, প্রবাসী ?···) ১০২
দৌহিত্রী (প্রদীপ জ্বালবে বলে অন্ধকারে বসে আছ। ওকি) ১০৩
রাত্রির মন্দির (কার ভয় কর ? স্থির খদ্যোতের সবুজ তর্জনী) ১০৪
জলস্থল (স্মৃতির চন্দনা ডাকে, আমি তীরে বসে, কিন্তু নদী) ১০৪
স্বপ্নপ্রয়াণ (স্বপ্নে কাল তোমায় ডাকলাম :) ১০৫
শান্তি আমার (শান্তি আমার চিবুক বেয়ে শান্তি,) ১০৬
মঞ্চ থেকে (মঞ্চ থেকে মৃতদেহ সরিয়ে দাও) ১০৭
দৃশ্য-কাব্য (রোদ্দুরে যাই, রোদ্দুরে যাই মিলিয়ে) ১০৯
শাদা মেঘ দাবি করে (শাদা মেঘ দাবি করে : একমাত্র আমাকেই ছাখো,) ১১০
মাতৃভূমি (পাঞ্চেন লামা যা-ই বলুন) ১১১
কনকঅম্বরম্‌ ফুল, আগে এর নাম তো শুনিনি (আমি কোথাও যাইনি,···) ১১২
শরীর ফুরিয়ে গেলে (দুই পা আঁকড়ে ধরে আমি তো উত্তীর্ণ হয়ে যাব) ১১৩
কুয়োতলায় (আর বার তুমি দাঁড়াবে কুয়োতলায় ?) ১১৪
মরমী কমল (সৃষ্টির আড়ালে এক পদ্ম আছে, সৃষ্টির আড়ালে) ১১৪
একটি কথার মৃত্যুবার্ষিকীতে (তুমি যে বলেছিলে গোধূলি হলে) ১১৫
বুলান মণ্ডল, বৃষ্টি (বুলান মণ্ডল, বৃষ্টি এল) ১১৫
ছোটনাগপুর (এক মুহূর্ত থেকে আরেক মুহূর্ত স্বতন্ত্র ;) ১১৬
চো ওউ, ১৭ই অক্টোবর, '৫৯ (তোমরা তো সহজেই দুর্বোধ পাথরে···) ১১৭
বাল্মীকির ব্রতে (নিশ্চিন্ত গহনে) ১১৯

তিনভাগ জলের আগুন (জলে গিয়ে নেমেছিলে, তুমি তার ‥) ১২১
বিদ্যুত উজ্জ্বল (জীবন শূন্য হয়ে গেল আলের ধারে এসে,) ১২২
পিতৃপুরুষ (এখনো দেখতে পাই রোজ বিধুশেখর শাস্ত্রীকে ;) ১২৩
শেষ পাতাটার আগের পাতায় (নীল মলাটের খাতার প্রান্ত ছুঁয়ে) ১২৪
মাধুকরী (গেল আমার ছবি-আঁকার সাজসরঞ্জাম,) ১২৪

নিষিদ্ধ কোজাগরী

বিভাব কবিতা (এই মুহূর্তে যে-মানুষটি চলে যাচ্ছে আমি তাকে মন্ত্রের ভিতরে তুলে নিলাম।) ১২৭
ঈশ্বরের প্রতি (যেদিকে ফেরাও উট, যত দূরে-দূরে তুমি কীর্ণ কর তাঁবু,) ১২৮
পথের মন্ত্র (আমরা) ১২৮
চৌকাঠ পেরিয়ে (একবার মাঠে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে, একবার) ১২৯
দুর্বলতা (রেললাইনের ওপার থেকে একটি শিশু এসে) ১৩০
একটি ফুলের প্রদর্শনীতে (প্রদর্শনীতে একটিই ফুল রাখা হয়েছে ;) ১৩০
চন্দনিয়া (একদিকে ফুল ফোটার মধ্যে চন্দনিয়ার মুখ) ১৩১
উৎফুল্ল গোধূলি (সকলের ছোটোবোন চলে যায় ছোটো-ছোটো হাতে) ১৩১
সারা শহরে কুয়াশা (সারা শহরে কুয়াশা) ১৩২
শীতের আকন্দ (শীতের আকন্দ) ১৩২
যে-রাখাল দূরদেশী (রাখালিয়া গীতি হাতে নিয়ে ভার্জিল) ১৩৩
নাগরিক (কার্পেটে ঢাকো রক্তের মোজেইক,) ১৩৩
মুখ (নদীর ওপারে আছ, কতদিন হল।) ১৩৪
দুঃখ (তবু কি আমার কথা বুঝেছিলে, বেনেবউ পাখি ?) ১৩৫
প্রেমিক (ললাটে তিলক যেন নব শশিকলা,) ১৩৫
কুঞ্জমাধবী (বুকের উপরে উঠে এলে কেন মাধবীকুঞ্জলতা ?) ১৩৬
পাশের বাগানে (অনীতা কি তবে মরেই গেছে ?) ১৩৬
হাওয়ার ভিতর (তোমার নামে যে-মেয়েটির নাম) ১৩৭
জল, ভূমণ্ডল, আত্মা ("আত্মার বয়স কতো, মাঝিভাই ?" মধ্যরাতে উঠে,) ১৩৭
নারীশ্বরী (আত্মনিহত দুটি মৃতদেহ) ১৩৮
ঘৃণা (তবু পুব হাওয়া না বুঝে তর্ক করে,) ১৩৮
সে (এক চিলতে রৌদ্র বেয়ে সে কিছু বলতে এসেছিল ;) ১৩৯
ব্রত (আমি এক-একবার তোমার সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করব ভেবেছি) ১৪০
এক বেশ্যা অনায়াসে ভিতরমন্দিরে ঢুকে যায় (বুদ্ধমন্দিরের দরজা‥) ১৪১
পাহাড়চূড়ান্তে এসে (পাহাড়চূড়ান্তে এই শরীরহীনতা) ১৪১
স্বপ্নিনী (স্বপ্নী চোখের একটি মেয়ে সকলকেই স্থলপদ্ম জানে,) ১৪২
বৈদেহী (প্রথম পাপ করার মতো বিবেক এল মনে,) ১৪৩
সেবিকা গোলাপ (গোলাপ এখনো আরো-কিছুকাল বহাল থাকুক,) ১৪৪

একটি ঘুমের টেরাকোটা (ট্রেন থামল সাহেবগঞ্জে, দাঁড়াল ডান পায়ে।) ১৪৪
আলোর ভিতরে চোর আছে (ধিকিধিকি সন্দেহের আগুন উঠল জ্বলে) ১৪৫
স্বদেশ্যা আমার (আলিঙ্গনের মহোৎসবে) ১৪৬
তোমার প্রেমে (তুমি যখন আমার উপর আস্থা রাখ ভীষণ অবাক লাগে ;) ১৪৮
পথে (তোমার কাছে যাবার সেতু জ্যোৎস্নায় ভরেছে,) ১৪৮
পথের পথিক (বলেছিলে পথিক হলে মুক্তি পাব।) ১৪৯
ব্যঙ্গ (অমুক্ত আবেগে বোনা অজিন আসনে) ১৫০
একটি ভুল প্রায়শ্চিত্ত (অনুতাপের সিঁড়িতে শুয়ে আছে) ১৫১
আরোগ্য ('সেরে গেছ ?' ফিরে এসে বলল আমায়। কোমল ব্যবহারে) ১৫২
গন্ধর্ব বিবাহ এক (কে আমায় চেনে বল ? এই বৃক্ষতলে) ১৫৩
উপলক্ষ (পথে অজগর ডবল ডেকার সেই অজুহাতে) ১৫৪
দাসী বলেছিল (দাসী বলেছিল হাঁটুর উপরে সল্‌তে রেখে :) ১৫৫
অকস্মাৎ (হ্যারিকেন বদল করতে গিয়ে হাতের বিদ্যুতে) ১৫৫
রাত্রির রাজপথ (ট্রামলাইনের রাস্তা সারায় রাঙা লণ্ঠন জেলে) ১৫৬
নতুন মন্দির হবে বলে (নতুন মন্দির হবে বলে) ১৫৭
ঘরনী (আসলে একটা আরশোলা) ১৫৭
রক্তজবা আচমকা আমাকে (এই শোনো, হাত ছাড়, মা আছেন·) ১৫৮
আহ্নিক অয়ন (বুকের নিশ্বাস বয় যতক্ষণ, ভীষণ ডাকাত) ১৫৯
দুটো উনুন (এ ঘরে আছে দুটো উনুন, রান্না দাও চড়িয়ে,) ১৫৯
ত্রয়োদশী (জ্যোস্নায় আমার বাবা কোথায় গেলেন ? কার কাছে ?) ১৬০
আনন্দের অন্ধকারে (তবে তোমার লাল রিবনে চড়ুই পাখির হাত !) ৬০
ছেলেটি (টিফিনের পয়সা জমিয়ে) ১৬১
বল আমার প্রার্থনায় কোথায় ভুল ছিল ? (হাঁটতে-হাঁটতে প্রার্থনা···) ১৬১
বিরোধাভাস (তুমি আমায় বলে দিয়ো না) ·৬২
প্রভু আমার (আমি তোমার বড়ো সাধের বুকের হৃদয় নাকি) ১৬৩
পান্থ (মাঝে-মাঝে স্পষ্ট করে বলা দরকার) ১৬৪
কার পায়ে ? (অচেনা শিশুর ঠোঁটে, গুর্জরী নারীর কর্ণমূলে,) ১৬৪
এক চিল্‌তে রোদ (আমায় তাকিয়ে থাকতে দাও) ১৬৫
অভ্রবহ্নি (নক্ষত্রেরা একরাতে পালিয়ে যাবে না,) ১৬৬
ঈষৎ-শিশুটি (মহিষের পিঠে চড়ে ঈষৎ-শিশুটি) ১৬৭
অ্যাকুয়েরিয়ামে (তুমি বুঝি ভেবেছিলে অ্যাকুয়েরিয়ামে মৃত্যু নেই ?) ১৬৮
পেলব আততায়ী (তৃণ আমায় অমন করে অবজ্ঞা কোরো না—) ১৬৯
ভ্রান্তিমুকুরের দয়া (ধনুকের বাঁকানো পিঠের মতো মাঠ ভেঙে···) ১৭০
আসন্ন (প্লাবিত জ্যোস্নায় ও কে মাউথ-অর্গ্যান) ১৭১
অ-সনাক্ত অজস্র মানুষ (এ যেন সবার ভালোবাসা) ১৭২
তুমি কি চেয়েছ শুধু নম্র নবনীত ? (ঈশ্বরের সঙ্গে এক বিছানায় শুলে) ১৭৩

ওরা (আমি তোমায় স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম। ওরা প্রথম বিশ্বাস করেনি।) ১৭৪
সত্য (যাকে বলতে সঙ্কোচ নেই, দিন ফুরোলে আমি) ১৭৫
নগরপ্রশ্ন ও সাঁওতালি প্রত্যুত্তর ('ইচ্ছা মিটে যাওয়ার পরেও···) ১৭৫
সময় (ঘড়িতে সূর্যাস্ত ধরে গেল,) ১৭৬
একটি শিশুর জন্য (এই জানালা থেকে আমি তোমার জননীকে) ১৭৬
এক-একজন ("বল রাজি ?") ১৭৭
বিজয়া (যে-মুহূর্তে আমি তোমায় সন্দেহ করতে শিখছিলাম) ১৭৭
প্রার্থনা (তোমার বেদীতে আমি বৃথাই চন্দন অর্পিলাম,) ১৭৮
তীর্থযাত্রী (মা আমাকে নিয়ে একদিন, হাত ধরে,) ১৭৮
ক্লান্তি (বরবটির খেত ঘুরে রামনাথ বিশ্বাস রোদ্দুর।) ১৭৯
দ্বিতীয়ার্ধ (সমস্ত দিন জ্যোৎস্না হয়ে গিয়েছিল,) ১৮০
সর্বস্ব (যা-কিছু নিয়ে খেলা দেখাতাম) ১৮১
করুণা (মাঝে-মাঝে মৃত্যু এসে কথা বলে পৈশাচী প্রাকৃতে,) ১৮১
স্থগিত (কেউ কিছু মনে কোরো না আমার সে সব প্রতিশ্রুতি) ১৮২

প্রতিদিন সূর্যের পার্বণ

ভয়ানক ভালো ওরা (যে এসে তোমাকে রোজ অপমান করে) ১৮৫
অহরহ সুখ (প্রত্যহ ঘেঁষে একটি সারস অন্তত একবার) ১৮৬
স্নিগ্ধ প্রতিশোধ (আমি সূর্যের জন্য পানীয় ঢেলে দিচ্ছিলাম) ১৮৬
নারীর নিজস্ব (একমাথা চুল নিয়ে ভালোবাসতে এলে) ১৮৭
অতীন্দ্রিয় মাকড়সার মতো (আমার ঘরের দেয়ালে পনেরো শতকের···) ১৮৭
দম্পতি (ওদের মধ্যে একটা গাছের দূরত্ব বেশ ভালো) ১৮৮
প্রতিদান (তিব্বতী বণিকসংঘ পশম চমরীপুচ্ছ লবণ সোহাগা) ১৮৮
পাখির সঙ্গে পটুয়ার খিটিমিটি (বেগুনি দুর্গাটুনটুনি জানে কী পর্যন্ত) ১৮৮
ভুক্তভোগী (হুবহু বিবাহিত তিনটি লোক) ১৮৯
আমাকে তবু তুমি অবিশ্বাসী হতে বোলো না (টেডি-বালক জামার···) ১৮৯
আত্মনিবেদন (তোমায় নিয়ে হাজার লক্ষবার) ১৯০

রক্তাক্ত ঝরোখা

বিভাব কবিতা (মারাঠি প্রজাপতি আমার, সুরে-সুরে ঈশ্বরের পায়ের কাছে) ১৯৩

প্রে মি কে র সং সা রে

নাকের একটি নথ (চোখের সামনে শুধু মিলায় নিজস্ব রাজধানী,) ১৯৫
জেরা (তুমি তাকে দেখেছিলে ?) ১৯৫
নির্বাসন (আমি যত গ্রাম দেখি) ১৯৬

ভাঙা সাঁকোর ধারে (মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা) ১৯৬
বধূবরণ (পানের তলায় তোমার মুখ ঢাকা,) ১৯৭
শুধু সবুজ (সারা দুপুর শুধু একটা সবুজ আমলকি) ১৯৮
কন্যা (আদুল গায়ে বাইরে আসিস না,) ১৯৯
দুই দম্পতির কাছে (দম্পতিকে বলেছিলাম দু-জনকে বিবাহ) ১৯৯
নর্তকী (পিঠের জামার বোতাম এঁটে নিতে) ২০০
মাঝরাত্রি (সে আমায় পূজা করে যেতে) ২০০
পুরুষ (তুমি কোন রন্ধ্র খুঁজে বিদ্যুতের প্রায়) ২০১
প্রসাধন (মুখের লণ্ঠনখানি তুলে ধরে তুমি) ২০৩
আস্তিক যেন না ভুলি (ভালোবেসে আগে মেনে নাও, পরে তর্ক কোরো…) ২০৩
ধাঁধা (একটা শালিখ অমাঙ্গলিক, দুটো শালিখ ভালো,) ২০৪
পৌরুষেয় (মেয়েলি কথাবার্তা চলে ও-ঘরে,) ২০৪
বেহায়া সময় (শ্রীনিকেতনের মোড়ায়) ২০৫
সম্বোধন (বালিকার চেয়ে কিছু বেশি নয়, কিন্তু যুবতীর চেয়ে বেশি) ২০৬
জলের মধ্যে (জলের ধারে তোমার কোনো ক্ষতি) ২০৬
লুকোচুরি (হাতের পাতায় জোনাকি লুকিয়ে রাখাও পাপ—) ২০৭
পরকীয়া (অবরুদ্ধ অপরাহ্ণে আমি) ২০৭
বাজি (শান্ত একটা লণ্ঠন দাও। তার নিচে বানাব) ২০৮
বৃষ্টি আমার কাছেই আছে (বৃষ্টি এলে তোমার কাছে থাকব,) ২০৮
পিতার প্রতিমা (মালীর অভাবে পিতা বাগানের ভার নিয়েছেন।) ২০৯
খেলা (কার কাছ থেকে উঠে এসে তুমি জড়িয়ে ধরেছ আমাকে !) ২০৯
পুরোহিতের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর (বিকিনি-পরা বিদেশিনীর সহজ বিকিকিনি) ২১০
ক্ষতিপূরণ (ভিড়ের মধ্যে সব সময় কেউ না কেউ থাকে) ২১১
ধ্যানধারণার ভিড়ে (কলকাতা-সময় অনুযায়ী) ২১২
তিন সঙ্গী (বাগনানে যাবার পথে তিনটে বাচাল সঙ্গে নেব,) ২১২
চামুণ্ডা (আহত পশুকে পাখির মতন দেখতে ;) ২১৩

র ক্তা ক্ত ঝ রো খা

রক্তাক্ত ঝরোখা (১—২৪) ২১৫—২২০

রু দ্রা ক্ষে র ঋ তু

অবরোহী প্রার্থনার মতো (প্রথমে পাখির মতো, পর্বতে-পর্বতে) ২২৮
অগ্নিতুষার (সুখোষ্ণ সুস্বপ্ন ত্যাখে যতেক বদমাশ) ২২৮
একা (পাখিটির মাতৃভাষা চেয়ে থাকা,) ২২৯
মাস্তুলতোলা বোট নিয়ে গোরাই সেতুর নিচে রবীন্দ্রনাথ (মাস্তুল সেতুর ··) ২২৯
পূর্বাভাস (কেউ আমাকে বলে দেয়নি ;) ২৩০
যুবসমাজের কাছে প্রার্থনা (আমি দীনবন্ধু বলে ডাকব ঐ বুড়ো লোকটিকে) ২৩১

অন্তাবশোভা (ও গেল যখন, পড়োশি মাঠের একটিও ঘন ঘাস) ২৩১
একটি মৃত্যু (ওলো তোরা দেখেছিস অষ্টমীর চাঁদ ?) ২৩৩
অঙ্কুশ (বাড়ির নাম 'ম্যাগ্নোলিয়া ভিলা',) ২৩৩
ছয় ঋতু ছত্রিশ রাগিণী (আকাশ আর আমার মধ্যে) ২৩৫
রুনার জন্য শীতের কবিতা (বয়সোচিত) ২৩৫
তারা দেবী, তোমার মন্দিরে (তারা দেবী, তোমার মন্দির কেন…) ২৩৬
ভ্রমণ (তবে আমার এখন থেকে জেগে-থাকার আমৃত্যু-ভূমিকা—) ২৩৭

যৌবনবাউল

উৎসর্গ

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

পূজনীয়াসু

পটভূমিকা অন্ধকার
আপন স্বত্ব অধিকার
রাখুক, আমি শরীর নোয়াবো না,

একটি মাত্র রাখাল যাক,
এ মাঠ একলা পড়ে থাক
নীরবে, আমি এ মাঠ ছাড়বো না।

মরণমদমাতাল ডোম
সবি করুক উপশম
শ্মশানে, আমি জীবন ছাড়বো না।

গঙ্গাজলে উঠুক পাপ
সূর্য হোক অপ্রতাপ
সকালে, আমি কিরণ বিকাবো না।।

ভগবানের গুপ্তচর
মৃত্যু এসে বাঁধুক ঘর
ছন্দে, আমি কবিতা ছাড়বো না,

অপ্রসর সমুদ্রকে
শামুক দেখুক প্রেমের চোখে
বিমাতা মাটি তোর কাছে যাবো না।

ধরিত্রীর নীবিবন্ধে
জগৎ যদি মহানন্দে
অন্ধ, আমি প্রহরী যন্ত্রণা

মানুষ গিলে নামের খনি,
আমার পরে এই ধরণী
সঙ্গোপনে অলোকরঞ্জনা॥

বুধুয়ার পাখি

জানো এটা কার বাড়ি ?   শহুরে বাবুরা ছিলো কাল,
ভীষণ শ্যাওলা এসে আজ তার জানালা দেয়াল
ঢেকে গেছে, যেন ওর ভয়ানক বেড়ে গেছে দেনা,
তাই কোনো পাখিও বসে না !
এর চেয়ে আমাদের কুঁড়েঘর ঢের ভালো, ঢের
দলে-দলে নীল পাখি নিকোনো নরম উঠোনের
ধান খায়, ধান খেয়ে যাবে--
বুধুয়া অবাক হয়ে ভাবে।

এবার রিখিয়া ছেড়ে বাবুডির মাঠে
বুধুয়া অবাক হয়ে হাঁটে,
দেহাতি পথের নাম ভুলে
হঠাৎ পাহাড়ে উঠে পাহাড়ের মতো মুখ তুলে
ভাবে : ওটা কার বাড়ি, কার অতো নীল,
আমার ঘরের চেয়ে আরো ভালো, আরো
নিকোনো উঠোন তার, পাখিবসা বিরাট পাঁচিল !
ওখানে আমিও যাবো, কে আমায় নিয়ে যেতে পারো ?

এইভাবে প্রতিদিন বুধুয়ার ডাকে
কানায়-কানায় আলো পথের কলসে ভরা থাকে,
ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখি আসে, কেউ তার দিদি, কেউ মাসি
রূপোলি ডানায় যারা নিয়ে যায় বুধুয়ার হাসি ॥

অরণ্যমধু

এখানে ওদের কয়েকদিনের ডেরা,
কুচক্রী মনে মধুচক্রের আশা,
একটু শুনবে ঝর্ণাতলায় জলকপোতের ভাষা—
তারপরে ফের শহরে ফিরবে এরা ;

একথা ভেবেই থমকে দাঁড়ালো সাঁওতালি মানুষেরা,
চমকে তাকালো পরস্পরের দিকে,
দুই দিকে ইউক্যালিপ্‌টাসের সুদীর্ঘ পংক্তিকে
কাঁপিয়ে উধাও সাঁওতালি হাওয়া—ত্রিকূটচূড়ায় বাসা।
আমূরুয়া থেকে প্রশ্নে অধীর হীর্নাটিলায়
বাহুর বৃন্তে বুনো দেহাতির নৃত্যলীলায়
বায়ুবল্লরী
প্রসারিত হয় মোহনপুরের প্রান্তশিলায়
ঘনবনরাজীনিবিড়নীলায়
ঝরে অশ্রুর অণুমঞ্জরী।

জমে হিমরেখা শালমহুয়ার শাখে,
ক্ষীণ রোদ্দুর শিথিল বলয়ে ঘেরা—
অরণ্যমধু ভরে নিতে মৌচাকে
শহুরিয়া যতো গ্রামে কেন বাঁধে ডেরা?

দেবযান

গাঁয়ের মহিম আর চড়কের মেলায় যাবে না,
কিনতে চাইবে না আর খেলনায় সাজানো সারা মেলা,
— তোমরা কি জানো কবে দু-আনায় সব যাবে কেনা?—
বলবে না তারিণীকাকা ভারী ঝক্কি এটার ঝামেলা।

গাঁয়ের মহিম আর মেলার দু-দিন শেষ হলে
খুঁজবে না পায়ের ছাপ কঙ্কালিতলার এই ঘাসে;
গল্প ঢের শুনেছে সে, এবার যাকেই গল্প বলে
তাক লাগিয়েছে: কবে দেখেছিলো মেলার সার্কাসে
ভীমের মতন বীর, ভিতু এক জড়সড় বাঘ।
আরেক তাঁবুর নিচে সকলেই ম্যাজিক-লণ্ঠন
দেখেছিলো, সে ছাখেনি। তারিণীকাকার 'পরে রাগ
মার কাছে বলে ওর প্রাণে ঘুম নামলো যখন,

পা টিপে-টিপে সেখানে গিয়ে যখুনি দাঁড়ালাম,
এগিয়ে এসে শুধালো : 'তোর নাম ?'
তাদের বুকে এ-নাম বুনে বলেছি : 'ভুলখিনে'—
আমাকে আমি ভুলেছি এই একুশে আশ্বিনে ।

অবিনশ্বর

'পঙ্কশয়ন ছেড়ে আজো যারা ওঠে,
তারপর চেতনার গভীর প্রহরে
ব্যথার জোয়ার লেগে ফুল হয়ে ফোটে
কী হবে তাদের জানো ?'
'ফিরে যাবে ঘরে'—
এই ব'লে চারিদিকে অপার মমতা
বিলিয়ে ছায়ার মতো তিমিরের কাছে
মিলিয়ে যাবার আগে ব'লে গেল কথা :
'তবুও ভেবোনা কিছু । আছে, সব আছে ।

আবার অনেক রাতে ঘুম মুছে ফেলে
দাঁড়িয়ে জলের কাছে দেখি তার ছবি,
রেখায়-রেখায় বাজে করুণ পুরবী ;
সবগুলি জোনাকির মণিকণা জ্বেলে
শুধালাম : 'ফের কেন নিশুতি প্রহরে
চুপিচুপি এলে তুমি ?'
'ফিরে যাবো ঘরে'—
এই ব'লে চারিদিকে অপার মমতা
বিলিয়ে ছায়ার মতো মুছে গিয়ে বাঁচে,
চাঁদের আলোয় তার মহানীরবতা,
তবুও ভাবিনা কিছু । আছে, সব আছে ॥

একটি হাঁসের রাজ্য

আশ্চর্য, আমার ইচ্ছা তবু অন্তহীন —
ছুঁয়েছি অনেক সূর্য অনেক পূর্ণিমা রাত্রিদিন,
এমন-কি জেনেছি আমি কিছুক্ষণ আগে
হিরণ্ময় দুটি শিশু ক্ষুদ্ধ এই প্রাণের পরাগে
কিছু মধু রেখে গেছে, ব'লে গেছে : 'তুমি বড়ো বোকা,
মুন্নার চেয়েও বোকা ! মিঠু, মিন্টু, মিষ্টুনী, অশোকা—
সবাইকে ঠেলে দিয়ে একা-একা কবিতা বানাও ;
আমাদের নিয়ে যেতে পারো নাকি চিড়িয়াখানাও,
যেখানে শুনেছি নাকি বড়ো-বড়ো জিরাফ হরিণ'—
আশ্চর্য, আমার ইচ্ছা তবু অন্তহীন !
কবিতা লিখিনা, শুধু মগ্ন হই জমার হিসেবে :
এই আলো এই শিশু কতোদিন আমায় কী দেবে ?

অথচ এখানে ছোটো পুকুরের পাড়ে
একটি প্রশান্ত হাঁস মাথা নাড়ে, যারে
ছুঁয়েছে জলের প্রেম বহুবার ; আলোর চন্দন
মেখেছে অনেক, তবু তবু ওর নিরাসক্ত মন -
যতোবার জল বাড়ে আলো তারে মিনতি জানায়,
সবার গ্রাহক হয়ে স্থির আছে নিস্পৃহ ডানায়,
সারা মুখে লেগে আছে হাসি ;
একটি হাঁসের রাজ্যে হবো আমি প্রসন্নউদাসী ॥

অন্ধ বাউল

আয় তাকে মন করবি চুরি,
সে আছে কোথায় কেউ জানে না—
অথবা সে যেন অধরা সুবাস
হাওয়ায় ছড়ানো হাস্নুহেনা !

একঠায় দাঁড়িয়ে পায়ে ক্লান্তি নামে মনেও হবেনা,
এদিকে বাক্যের বাণ বন্যার মতন মেতে উঠে
ভর্ৎসনা ছড়াবে। আর এইভাবে অনর্গল ফেনা
নিকটে নিক্ষিপ্ত হবে বারোমাস শুষ্ক ওষ্ঠপুটে।

বহুদিন থেকে এঁরা দুজনেই শহরবিদ্বেষী ;
সাঁওতাল পরগণার গ্রামে উদ্বোধিত যুগলহৃদয়
অপার্থিব সুখ খোঁজে। পরস্পরবিরোধী উভয়
সংশয়িতপ্রাণ কবে কোন পথে পরস্পরমুখী
হতে পারে, সে হিসেব মনে মনে করি। কম বেশি
ভুল হয়, জানি তবু বহু নিচে কোনো ফল্গুস্রোতে
মিশেছে ওঁদের সত্তা ঢেউ হয়ে, তার সে-সন্ধান
সপ্রমাণ দিতে পারে কে এঁদের ? কে নেবে সে ঝুঁকি,
এখনো মেলেনা কূল এ-চিন্তার ; ধর্মের জগতে
দুজনের একই পথ, মর্মের জগতে এত একা
নিজেকে ভাবেন বলে ব্যক্তিগত সুখদুঃখে প্রাণ
অহর্নিশ কুণ্ঠাগত। কখনো শান্তির নেই দেখা।
বিক্ষুব্ধ শিরায় ছাওয়া ঠাকুমার শীর্ণ হাত কাঁপে
সারাদিন, তাদেরো তো লক্ষ্য কাজ। ভোর থেকে রাত
দেখেছি সমস্তক্ষণ ব্যস্ত তারা। সূর্যের উত্তাপে
যেটুকু মহার্ঘ মেলে, যথেষ্ট তা নয়। জপমালা
আবর্তিত সর্বক্ষণ, দুবেলা আহ্নিক, হরিনাম,
গীতা চণ্ডী রামায়ণপাঠ, সূর্যপ্রণামের পালা,
ব্রতউদ্‌যাপন, আর, সবশেষে স্বামীর সমীপে
বোঝাপড়া। ঠাকুমার সব আকাঙ্ক্ষার পরিণাম
হারায় দিনের বৃত্তে। পরিশ্রমে ক্রমশ দুহাত,
দু-চোখ বিশ্রাম চায়, প্রার্থনায় নিয়োজিত হয়ে
কাম্যফল মেলে কই ? এর চেয়ে নির্বাণের দ্বীপে
মুক্তি যদি নেওয়া যেত, সান্ত্বনার সমুদ্রবলয়ে !

তার ঢের দেরি আছে, তিয়াত্তর অতিক্রান্ত, তবু
অতৃপ্ত বাসনা। বলো, পৌত্রের বিবাহ দেখে যেতে
কে না চায় ? তাই আরো দীর্ঘ অপেক্ষায় জবুথবু
হতে হবে। হোন্ দাদু বিরূপাক্ষ। তবু চুপিচুপি
শতায়ু হবেন তিনি কামনার মোম জ্বেলে-জ্বেলে।
সাঁওতাল পরগণার গ্রাম মন্ত্রমুগ্ধ, রাত্রির সঙ্কেতে
ভয় নেই, ঠাকুমার হাত কাঁপে, হাতে কাঁপে কুপী,
বাড়ির বারান্দা কাঁপে সে-আলোয়, বাঁশবনের গায়ে
জড়োসড়ো পাতা কাঁপে, কাঁপে বনভূমি। তাকে ফেলে
কুপীর করুণ আলো অগ্রসর। হয়তো-বা ভূমা
যে এখনো দূরগম্য, তাকে খুঁজে নেবে। নিরুপায়
প্রান্তরে দাঁড়িয়ে যেন বড়ো একা আমার ঠাকুমা॥

পরান আমার স্রোতের দীয়া

আছে, একটি কথা আছে, যেকথা শুনলেই তার মুখ
অন্ধকারে জ্বলে উঠবে, জীবনের জরাজীর্ণ ডালে
ফুলের মতন ফুটবে একসারি কবিতার সুখ ;
সে তখন নরলোকনিয়তির শূন্যের মৃণালে
ফোটাবে আকর্ণমূল ফুল্লধ্বনিরণিত কমল,
বুক জুড়ে রবে সেই শ্রবণাভিরাম নীলোৎপল,
অপ্রতিভ তার কাছে ইন্দ্রধনু রামের ধনুক,
যাদের সাহায্য করে অমরাবতীর নভোতল।

প্রতিটি সন্ধ্যায় তার প্রিয়াকে বলেছে :
'আমাকে বলাও সেই কথা, যেকথার প্রতিধ্বনি
বৈকুণ্ঠবাসীরে করে আমার একান্ত প্রতিরূপ—'
শুনে সে-দর্পিতা এক দেবতার দিকে চলে গেছে,
কারণ দেবতা সে তো অবান্তর সৌন্দর্যের স্তূপ,
পুরাণে যাদের করায়ত্ত ছিল মৃতসঞ্জীবনী।

সময়ের ঘূর্ণিজলে ভেসে
এখনো চলেছে, চলেছে সে।
একটি কথার স্বপ্ন তাকে ঘিরে কাঁপে সর্বক্ষণ,
মায়ের বুকের কাছে সন্নিহিত শিশুর মতন
কী সেকথা, ঘাটে-ঘাটে যেকথার টানে
আজো তার বেলা কাটে ?   অকূল পাথার শুধু জানে ॥

বসুধারা কল্যাণের ব্রতে

আবার এখন আমি শতকের জতুগৃহদাহ
পার হয়ে বুকভরে নেবো শুধু রাত্রির প্রবাহ ;
আমার প্রাণের মূল্যে ফের
পরিত্রাণ হবে জগতের
তামসী তাপসী, ফের ফিরে এসো আমার জগতে,
ঘাটে-ঘাটে আবার ভাসাও ঘট বসুধারাব্রতে
আলোতে আলোতে।

আহা এ কেমন ফুল নির্বেদের বিবর্ণ পরাগে,
ফুলের ভিতরে নদী জাগে,
তটের পঞ্জরে যার সুগন্ধের জোয়ারী সেতার
ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে অববাহিকার পূর্বরাগে।

নির্মোহিনী যুগকন্যা, তুমি জেগে ওঠো একবার।

শহীদের মতো আজ বিদীর্ণ অথচ সুকুমার
শিশুর উল্লাসে মেতে জেলে দিতে হবে আত্মহোম,
উৎসর্গ অন্তিম সত্য আর সে-ই সত্য যে প্রথম,
দিগ্বলয়ে গোধূলির অন্য নাম উৎসর্গ উমার।

এইবার হৈমবতী গৌরীকেই নয়
মহেশ্বরমানবেরও প্রাণধূপশিখা

আবার জ্বালাতে হবে, আমাদের শেষ পরিচয়
শুধু এই সমর্পণ, এ সমুদ্রে মৃত্যুর কণিকা,
শুধু এই অন্তর্জলি মানবিক অমৃতপ্রবাল
জন্ম দেবে কাল।

আমারো মৃত্যুকে মৃত্যুহীন
সমীচীন
ক'রে যাবো ব'লে
চলেছি, আমার হাতে শতাব্দীর সতী
স্তব্ধ, তবু মরণেও তপস্যায় দোলে,
অতসী অঙ্গের অণু দিকে-দিকে সিংহদ্বার খোলে,
আমারো এখন থেকে আজীবন আয়ুর আরতি।

আমি তবু কাকে যেন পিছনে হারিয়ে
এসেছি অনেক দূরে, তাই
বারবার নিজেকে হারাই।
একুশ বছর আগে জীবনের দেয়ালি সাজিয়ে
যে আমায় আবাহন করেছিল, আজ
নিশ্চিত বুঝেছি কোনো গহনকুহেলি নিশিডাকে
হারিয়ে ফেলেছি তাকে দু'পহর রাত্রির নিদাঘে,

তারপর ভোরবেলা আমি এক নিঃস্ব নটরাজ।
আরো জানি, প্রায়শ্চিত্ত কিছু নেই এর,
সুরভি জ্বালাই যদি প্রতিদিন তপোভিরাত্মনা
তাকে তবু কখনো পাবোনা।
সে আমায় জন্ম দিয়ে বর্ষে-বর্ষে এই জীবনের
অমৃতা হয়েছে নিজে, আমি তার সর্ব আরাধনা
সমস্ত সাধনা বুঝি চূর্ণ করে দিতে
শ্মশানসতীর্থ নিয়ে গেছি তার পবিত্রবেদীতে ;
সে অথচ শীতগ্রীষ্মে পদাবলী খৈরজসজল,
আমার প্রাঙ্গণে রাখে সম্পন্ন ব্যথার ফুল, ফল।

শেষবার জেগে ওঠো হে পরমা, শতাব্দীর সতী,
আমাকে আবার করো বসুধারা কল্যাণের ব্রতী—
ঘাটে-ঘাটে আমাকে তোমার
স্বর্ণঘট করে ভাসাবার
সুবর্ণসুযোগ এলো, ব্যর্থ করবে তুমি তাকে ?
যদি এই নদী হয় কীর্তিনাশাও
আমাকে ভাসাও, তবু খুঁজে নিতে দাও
একুশ বছর ধরে ভুলে থাকা বসুমতী-মাকে ॥

মুক্তধারা

তোমার মনের গভীর অরণ্যে
গোপন ব্যথার অঞ্জলি আজ আনম্রঅঙ্কুর
এখনো তার ইচ্ছা নামঞ্জুর
জানাও তারে : 'তুই এবারে আলোর শরণ নে'

আমার আলো তোমার ছায়াটিরে
রাখবে ঘিরে, পুষ্প যেমন সুদীপ্ত বিশ্বাসে
কোরকে তার শান্তি রাখে সযত্ন বিন্যাসে,
পাপড়িগুলি হাওয়ার ভারে যদি-বা যায় ছিঁড়ে
অক্ষত সেই শান্তি হাসে সংহত উল্লাসে।

আজকে তোমার আজন্ম-বন্দীরা
মুক্তি পাবে, তাদের পথে তীর্থতোরণ খুলে
সূর্য হবে রক্তজবা তোমার সোনার চুলে—

তোমার কান্না আমার হাতে আনন্দমন্দিরা !

কল্যাণেশ্বরীর হাট

প্রসন্ন প্রদীপ জ্বেলে ব'সে আছে ঝম্‌রুর প্রণয়ী ,
দুচোখে খুশির শিখা অনির্বাণ—দূরের ঝম্‌রুকে
নিশ্চিত পেয়েছে বুঝি ; তার সেই ধ্রুব জ্যোতির্ময়ী
সেও যেন কালোচুলে আর কালোমুখে
কী আলো জ্বালিয়ে আজ প্রেমিকের প্রত্যয়ের কাছে
প্রগাঢ় নিষ্ঠায় ব'সে আছে।

ঝম্‌রুর ঝুড়ির চুড়ি হাটের মানুষ ভালবাসে
একথা কল্যাণেশ্বরী জানে,
এবারো কিনেছে তারা সেই চুড়ি গভীর বিশ্বাসে.
তাকে প্রদক্ষিণ ক'রে হাটের মানুষ ফিরে আসে
একটি বিন্দুর দিকে বৃত্তের একাগ্র অভিযানে।
ঝম্‌রুর প্রণয়ী সেই দুর্লভ সুযোগে বেঁচে গেছে ;
অনেক তরমুজ আজ দুইহাতে বিক্রয় করেছে।

ওদিকে একটি শিশু কিছুতেই বালুর গম্বুজে
উত্তীর্ণ হলো না, তার মন
বালির মন্দিরে কোনো দেবতাকে ক'রে অন্বেষণ
অবশেষে ব্যর্থতায় ছিলো মাথা গুঁজে,
আচম্বিতে এইবার ধুলি থেকে উঠে
অবাক ঝম্‌রুর দিকে ঝুমঝুমি বাজিয়ে এলো ছুটে।

অথচ যে-বিস্মরণী বটের ছায়ায়
এ-হাটের প্রাণকন্যা ব'সে আছে আলোর মতন,
কে যেন সহসা তাকে ছুঁয়ে গিয়ে চকিতে মিলায়—
ঝম্‌রুর প্রণয়ী ছাখে বেলা শেষে হঠাৎ কখন
কে নিয়েছে চুরি ক'রে সবগুলি পরশরতন,
বটের পাতায় তাই সকল প্রতিষ্ঠা ঝরে যায় !

কে নিয়েছে চুরি করে? এ হাটের জ্যোতি
দু-হাতে নিভিয়ে দিয়ে সরে গেছে নেপথ্যে আবার?
সেকথা জানে না স্তব্ধ কল্যাণেশ্বরীর অন্ধকার,
জানে না আনম্র ঝমরু যার হাতে হাটের নিয়তি ॥

অনন্ত মুহূর্ত

ওকে তুমি দাঁড় করিয়ে রেখো না, জানি তোমার
হিয়াতটে লোটে শঙ্কা, দ্বিধার দরিয়া বয়,
পরিপার্শ্বের ভূমিকা করিনে অস্বীকার
কিন্তু মানুষ? তার তো সময় অসীম নয়।

ওকে তুমি দাঁড় করিয়ে রেখোনা, যদি ওরেই
এক চাহনিতে ভালো লেগে থাকে, জানিয়ে দাও,
মালা নাই থাক, ঘিরে ফেলো শুধু বাহুডোরেই,
স্বেচ্ছাবিজিতা ওরি লজ্জায় সিঁথি রাঙাও।

ওকে তুমি দাঁড় করিয়ে রেখোনা। যদি তোমার
বাসী লাগে ওকে, তাই ব'লে দাও, সে-অপমান
স'য়ে যাবে, ও যে বুকে নিতে পারে অন্ধকার,
কেননা ওকে যে বেঁধে যেতে হবে ক'খানা গান ॥

দুটি হাসি

উজ্জ্বল তোমার হাসি, দুর্লভ উপমা।
তবুও অনন্যা, শোনো, তার পাশাপাশি
আরেক প্রদীপে
দেখেছি আমার মুখ নিরুপম জ্যোতির সমীপে।

পাড়ার গলির মুখে বসে-থাকা নেয়ামৎ বুড়ো
বারোমাস ছিন্নবাস, জীবনকে তবু সে করে ক্ষমা,—

আমি যাকে এক পয়সা দিতে গিয়ে ভাবি :
সে আমায় দিতে পারে কুবেরের ভাণ্ডারের চাবি—
শোকশীর্ণ মুখে তার কী অপার করুণার হাসি
মোমের প্রভায় জ্বলে সারাবেলা পরম নিগূঢ়
গোপনীয়তায় অবিনাশী।

বলা-ই বাহুল্য তার ভিক্ষার ঝুলিটি
সদাই বাড়ন্ত থাকে।
দিনান্তে কে তবু লিখে রাখে
মলিন ললাটে ওর বরাভয় দেবতার চিঠি,
সন্ধ্যার আজান তার ত্রিভুবন আনন্দে কাঁপায়॥

কৃশ বেদনার সাধনা

হাওয়ার ভিতরে কার ক্ষমা ঐ কাজ ক'রে যায় ;
কঠিন বটের বর্জিত পাতা অবমাননায়
ঝ'রে গিয়েছিল, হাওয়া চুপে এল মায়ের মতন,
নিয়ে গেল ওকে আকাশের গায়ে।

একটি কিশোর মাঠের কিনারে, একটি অতীত
বুকে ক'রে আছে, এখুনি তো পায়ে
ঠেলে দিতে পারে, ও তবু কেন যে সেদিনের শীত
বুকে ধ'রে আছে। ওকি মনে করে অরূপরতন
গড়বে শীতের কৃশ বেদনার সাধনার বলে ?

বিখ্যাত সেই অরূপরতন রচনার পণ
যদি ভেঙে যায়, কিম্বা ও যদি শপথের ছলে
নিজেকে ভোলায়··· তার আগে ওগো জননী পবন
ক্ষমা ক'রে ওকে নিয়ে চলে যাও আকাশের গায়ে॥

হাটের পরে

ভাঙা হাঁড়ি, কুনো কুঁজো—জল নেই। এপাশে দাঁড়িয়ে
ঘুম-ঘুম ছাতুঅলা, ঘরে যাবে। বেলা ভাঙে-ভাঙে
দর্শক বটের জটে, প্রতিচ্ছায়া কালো জলে রাঙে,
যেখানে নতুন-কেনা নীল চুড়ি অভিমান নিয়ে
ফেলেছে সাঁওতালি মেয়ে—সেকথা বোঝে না সূর্য, সেও
ঘরে যাবে। অতিক্রান্ত এক ঝাঁক পায়রার আওয়াজ
বিমর্ষ বাতাসে ভাসে, প্রতিধ্বনি আসে: 'এল কে ও
কে ছড়াল মায়াকান্না?'
ছাতুঅলা ভাবে, মিছে আজ
এতখানি মেহন্নত, দুই দিন দুই অন্ধকার
ঘুরে এসে কী পেল সে? দেশে বউ, এই সন্ধ্যাবেলা
সে-ও কি প্রত্যাশা কারো? সব ক'টি ঝড়ের ঝামেলা
পার হ'য়ে পাবে নাকি ছ'টাকার বাজুবন্ধ তার?

যেতে গিয়ে ক্লান্তি আরও, গোরু দুটি অবাধ্য বেহায়া
বড়ো অসহায় নিজে, এখনো অনেক পথ ঠেলে
বোঝা টেনে নিতে হবে; শালজামশিরীষের ছায়া
বিস্তৃত ছলনা হ'য়ে একজোট কেন এ-বিকেলে?
দীর্ঘ কেন মেঠো পথ? এবারো কি নেশার দোকানে
কথা ব'লে স্বল্পপুঁজি দুঃখভোলা লুব্ধ ক্রেতাদল
ফিরে যাবে? ঘরে গিয়ে আজো নাকি বাজাবে মাদল?
একা পথে ছাতুঅলা, সে-ও খোঁজে সময়ের মানে।

মন্দ্রসপ্তক

একটি দীপ এখনো জ্বলে, নিভিয়ে দাও তাকে,
দিয়োনা, সাড়া দিয়োনা আর আলেয়া যদি ডাকে ;
শিখার উপলক্ষ্যে যদি পতঙ্গের আশা
সাজায় কোনো মদির ভালোবাসা,
আলোকমালা ছিন্ন করো—জ্যোতির জিজ্ঞাসা
কিছুই নেই, তৃপ্ত সে যে আত্মসুখী থাকে—
অন্ধকার শুধিয়ে মরে, সাগরে খেয়া রাখে।

হৃদয়, তুমি তমিস্রার অথৈ নীল জলে
গিয়েছ ভরে, জোয়ারী সেই সেতারে ঝঙ্কার
জ্বালিয়ে দিয়ে কর্ণধার অন্ধকার চলে,
সুরের ভারে যখন হবে অবশ দুইধার,
রাত্রি তোকে সহসা দেবে গভীর সম্মান :
সৌম্য এক যন্ত্রণার ইমনকল্যাণ।
কিছুই দেখা যাবে না আর, দুধারে মিশকালো,
হৃদয়, সেই সময় বুঝি এসেছে, এইবার
তৃতীয় আয়তনের আলো জ্বালো।

এই যে তুমি একুশবার ছুঁয়েছো শরতের
মেঘের স্রোতে মগ্ন কাশফুল,
শুভ্রতার কেন্দ্রে তুমি বৃত্ত হয়ে ফের
হেমন্তীর দীঘল এলোচুল
কুসুম দিয়ে ঘিরেছ, সেই মায়ার ঘনঘের
এখনো সে তো করেনি নির্মূল!
দিনের ছেলে মুকুল রাখে, রাতের মেয়ে ফল,
দুয়ার থেকে দুহাতে এসে সবার আয়োজন
হয়েছে তবু অন্তহীন তুহিন সমতল—
আরতি ক'রে এখুনি আঁকো তৃতীয় আয়তন ;

যে-আলো ছেঁড়ে ইন্দ্রজাল আপাতদৃষ্টির,
ছায়ার নিচে খদ্যোতের ধ্যানের ধূপে জ্বলে,
ভরসাভীরু আঙুল দিয়ে স্তিমিত ব্রততীর
প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন লিখে চলে,
ভিক্ষুণীর সাধন বোনে বৃক্ষবেদীতলে—
তিমিরদূতী সে-আলো নামে প্রদীপনেভা ঘরে,
প্রতীক্ষায় পঞ্চতপা অথচ পরাজিতা
যে-মেয়ে জাগে ক্ষমার মতো সজলসুস্মিতা,
মৃত্যুময়ী নদীর মতো সাগরে আয়ু ধরে,
তমসাতীরে দাঁড়িয়ে সেই শতাব্দীর সীতা—
দুয়ার খোলো ভোরের অভিমানী,
রাতের ঘরে এসেছে তোর ইমনকল্যাণী !

অপূর্ণ

দ্বিতীয় ভুবন রচনার অধিকার
দিয়েছ আমার হাতে—
এই ভেবে আমি যত খেয়াপারাপার
করেছি গভীর রাতে,
প্রতিবার তরী কান্নায় শুরু হয়
কান্নায় ডোবে জলে,
হাসিমুখে তবু কেন হে বিশ্বময়
তোমার তরণী চলে ?

তারপর তীরে ফিরে আসি নিরালায়,
মূর্খনেশায় ভাবি,
দূর থেকে তুমি আসবে অধীর পায়ে
বলবে : 'আমার দেশে
তোর সেই খেয়া উজানে গিয়েছে ভেসে,
ফিরিয়ে আনতে যাবি ?'

উত্তর দেব : সেই তরী তুমি নাও,
ছিন্ন সে-পাল তুলে,
আজ তুমি শুধু একবার পাড়ি দাও
এ-নদীর কালো চুলে ;
দেখি কোন্ ফুলে প্রফুল্ল কর তার
শোকার্ত শর্বরী,
এই পারে আমি বাসী ফুল তুলি আর
বালির পসরা করি ।

বুদ্ধপূর্ণিমার রাত্রে

সুগত, এ-জন্মে আমি কেউ না তোমার ।

আজ তবু সন্ধ্যায় যখন
জাতিস্মর জ্যোৎস্নার ঝালরে
তোমার হাসির মন্ত্র নীরব ঝর্ণায় ঝ'রে পড়ে,
আমারও নির্বেদ ঘিরে পূর্ণিমার তিলপর্ণিকার
অগুরু গন্ধের বৃষ্টি—মনে হল এখানে আবার
তোমার সময় থেকে বহুদূর শতাব্দীর তীরে
জন্মশ্রীজীবন পাব ফিরে,
ফিরে পাব পরশরতন ।

মাঠের পিঞ্জর ভেঙে কখন সহসা
কে অনন্যা উঠে এল, দীপ্তি যার অহল্যার চেয়ে
উত্তীর্ণ হয়েছে আরও দুর্বিষহ ধৈর্যের তমসা
গৌরীর চেয়েও যার রুচিরাক্ষমালা
প্রতিজ্ঞার প্রতিভায় জ্বালা—
এবার আমায় দেখে ভ্রূকুটির ভস্মরেণু ছেয়ে
দুচোখে শুধাল :
'কী নাম তোমার বলো, হোমাগ্নিশিখায় তাকে জ্বালো ।'

দূরে সরে গিয়ে আমি ভীরুকণ্ঠে উত্তর দিলাম :
'এ-জন্মে জানি না—তবু আর-জন্মে আনন্দ ছিলাম।'

শুনে সে-নারীর মুখে সকল স্থৈর্যের আরাধনা
ভেঙে গিয়ে জ্ব'লে উঠল ভ্রূযুগবিলগ্ন অগ্নিকণা :
'তুমি সে-আনন্দ বুঝি একদা বুদ্ধের অনুগামী ?
প্রভুর প্রয়াণ হ'লে তোমারই তো শোক
শপথের রূপান্তরে জ্বলেছিল অভয়, অশোক,
স্মিতমুখে বলেছিলে যুগে যুগে জন্ম-জরা-জ্বালা
পার হয়ে নিয়ে যাবে প্রভুর মৈত্রীর ঝরামালা,
দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে ম্রিয়মাণ মানুষের ব্রত
করপুটে তুলে নিয়ে হবে তুমি নূতন সুগত,
আমি সে-আকাঙ্ক্ষা শুনে ফল্গুনিবেদনে
বক্ষের দেউলতলে সাজিয়েছি তোমার প্রণামী,
সে-ভিক্ষু এখন তুমি পথে-পথে ভিক্ষুকের মতো
বীতব্রত ঘুরে-ঘুরে কী পেয়েছ জীর্ণ এ-জীবনে ?'
এতগুলি কথা ব'লে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে
বৈশাখী নিদাঘে তার শ্রাবণের ঢল নেমে আসে,
জলের একতারা বাজে ত্রিতাপতৃষ্ণার ডালে-ডালে
প্রাণের প্রান্তরে শুক্‌নো আলে।

তারপর চলে যেতে যেতে
তাকাল বিষণ্নচোখে দরিদ্রধূসর ধানক্ষেতে
বৃষ্টির বাসনা যেন কৃষাণীর দুনয়নে কালো—
বিপুল বিস্ময়ে শুধালাম :
'ব'লে যাও কী তোমার নাম ?'
আবার ভ্রূযুগে তার ভ্রূকুটির আগুন ঘনাল :
'এ-জন্মে জানি না—তবু আর-জন্মে সুজাতা ছিলাম।'

জনান্তিকে

হর্লাঝুরির শীর্ণ সাঁকোর আড়ালে
সবার চাউনি লুকিয়ে
সবার হিসেব চুকিয়ে
কোনো সন্ধ্যায় একলা নীরবে দাঁড়ালে
হঠাৎ দেখবে দুজন আসছে পথের পাথর কুড়িয়ে।

তোমাকে দেখলে বলবে না ওরা: 'কোন্ দেশে তুমি থাকো?'
তোমার দেশের নদীগুলি থেকে কত দূরে এই সাঁকো?
তাদের নিশানা ফেলে
কেন এলে, কেন এলে?'
তুমি শুধু যদি একটু তাকাও, তবে সেই বুড়ো এসে
আবছা গলায় বলবে তোমায় অপরূপ ভালোবেসে:
'ঐ যে আমার সঙ্গে দেখছ কোনোদিন ওকে চাইনি,
নিজেকে নিয়েই নিবিড় মগ্ন ও একটা বুড়ী ডাইনী;
আমার শ্রাবণ আমার ফাগুন
সব ঘিরে ওর স্বার্থের ঘুণ,
ওকে ছেড়ে তবু একটি দণ্ড অন্য কোথাও যাইনি!'
—এই কথা বলে সে-বুড়ো ঈষৎ দূরে
দাঁড়িয়ে থাকবে আকাশবিলীন বিষণ্ণ রোদ্দুরে।

অমনি তখন সেই বুড়ী এসে শরমের দোর খুলে
তোমাকে বলবে কম্পিত এলোচুলে:
'ঐ যে আমার সঙ্গে দেখছো, ওরি সাথে পোষ মানিয়ে
ফাল্গুন কেন দীর্ঘ হয়নি, আর্জি করিনি তা' নিয়ে;
কেন সে দেয়নি গোধূলিগন্ধা ফুল,
এ নিয়ে কখনো করিনি হুলুস্থুল,
দিন কাটিয়েছি ছোট নক্শায় তুহিনতৃপ্তি বানিয়ে।'
—এই কথা ব'লে আবার দুজন
উভয়েই যেন এক প্রাণমন
হাতে হাত রেখে এভাবেই যাবে সেই বুড়ো সেই বুড়ী,
এই দেখে সব বাসনা ভুলেছে বিমূঢ় হর্লাঝুরি!

'সূর্যকে যে পথ দেখাবে, আমার প্রেমিক সে যে,
সবার কাছে আসবে যখন, সহোদরা নম্র নীহারিকা
ভাইয়ের ললাট জুড়ে তখন পরাবে জয়টিকা ;
সবার মনের মন্দিরাতে বন্দনা তার হঠাৎ উঠবে বেজে,
জীবন হবে অভয় আলোর জয়ধ্বনিময়,
আমার সঙ্গে মিলন হ'লে সেই যে দোঁহার পূর্ণ পরিচয়,
অমর দীপে উঠবে জ্ব'লে—অতল, গভীর, সমুদ্রসঞ্চারী'—
এই ব'লে এক হোমানলে নিজেই জ্বলে সূর্যমুখী নারী ॥

তমসো মা

দেখেছি সে-এক অন্ধ ধানক্ষেতে সারারাত্রি ঘুরে
সূর্যকে জাগাবে ব'লে বিষণ্ণ বাঁশীর সুরে-সুরে
একা-একা জ্ব'লে ওঠে, আবার বিদীর্ণ আলে-আলে
বিধাতার মতো বুঝি স্বরচিত সে-আগুন জ্বালে !

তার দিব্য দুই হাতে আমাকে ছুঁয়েছে কালরাতে,
স্পর্শের অনলে কেঁপে পুণ্য হল আমার শরীর ;
অগ্নিদেব শুধালেন : 'হাত রাখ আমার দুহাতে,
মানুষের নামে বল এই গাঢ় শীতশর্বরীর
আড়ালে যে-প্রাণজ্যোতি, তুমি তাঁরবিতন্দ্রিত বীণা
তোমার জীবনে নিয়ে এ-বিশ্বে বিকীর্ণ হবে কিনা ?
রাগিণীর বৃষ্টি হয়ে খরশর জ্যৈষ্ঠের জ্বালায়
প্রান্তরে ছড়াবে নাকি প্রাণভরা পুবালিদখিনা,
রূপান্তর দেবে তাকে হেমন্তের হিরণ্যথালায় ?'

নিরুত্তর সরে আসি উন্মাদের আলিঙ্গন থেকে,
দূরে গিয়ে তাকে ঠিক ধূর্জটির মতো মনে হয়,
স্থবির জটার নিচে আলোর গভীর গঙ্গা ঢেকে
চলেছে একক, মৌন। চারিদিকে তমিস্র সময়

সমুদ্রগর্জনে বয় ; সে যদি জিজ্ঞাসা করে 'আলো' ?
ফেনিল ফণায় মিশে প্রতিধ্বনি 'আলেয়া' শোনালো।

আরেক অন্ধকে দেখি চৌরঙ্গির কুরঙ্গমায়ায়
নিজেকে ভোলে না, একলা প্রার্থনার বৃত্ত টেনে যায়,
শব্দের অনৈকতানে এস্‌প্লানেড দেউলিয়া মলিন,
সে তবু আত্মস্থ, স্তব্ধ, গোপন গুঞ্জনে বক্ষোলীন
ব্যাঞ্জোর আনন্দ বুনে ক'রে যায় পথ প্রদক্ষিণ,
সুরের উজ্জ্বল উৎসে জনতাকে নিয়ে যেতে চায়।

সে কি জানে ঢের দূরে ভূগোল ভোলানো কোনো গ্রামে
আরেক সতীর্থ তার রুগ্ন মাঠে ধারাজলে নামে ?
না জানুক ক্ষতি নেই, তবু উভয়ের ফল্গু চোখ
জ্বলুক ঝলুক, তারি রশ্মিপাতে ভূলোক দ্যুলোক
দৃষ্টির প্রদীপে ফের উদ্ভাসিত হোক। দিকে-দিকে
আমরা জন্মান্ধ চলি ভুলে গিয়ে নিহিত জ্যোতিকে।
রাত্রিদিন খুঁজে-খুঁজে অমাবস্যা অসির ধারালো
আমারো প্রাঙ্গণ আজ ক্লাউনের প্রেমের মতো কালো।

তোমরা দুজন এস, হে যুগ্মজ্যোতিষ্ক অতৃতীয়,
এস, অবতীর্ণ হও আমাদের বিবর্ণ বিকেলে,
এস, অবকীর্ণ হও শ্বেতাভ ঝর্ণার পাখা মেলে—
গভীর জলের শিল্পে জরা হোক শান্তির অমিয়,
ধরার কলঙ্ক হোক তোমাদের অলঙ্করণীয়,
তারপর ফিরে যেয়ো তৃতীয় নয়ন জ্বেলে-জ্বেলে॥

মায়ের জন্মদিনে

আনম্র প্রণতি আঁকি।
উঁচুনিচু জীবনের টিলা
যতদূর দেখা যায়, অথবা না যায়,
সবার শিখর জুড়ে স্বাভিমুখী আরতি সাজায়
যৌবনবাউল সূর্য, উৎসলীনা সবিতার লীলা
দেখবে ব'লে পূর্বাচল প্রতীক্ষার আগুনে রাঙায়।

তখন যতই কেন আমি
হতে চাই প্রাত্যহিক বিস্মৃতির তিমিরে বেনামী,
রশ্মির অসির ঘায়ে তুষারের সমস্ত অছিলা
লজ্জায় লুটিয়ে পড়ে সাবিত্রী সে-সবিতার পায়ে।

সারাদিন ভুলে থাকি, তবু সেই স্রোত বেয়ে সারাদিনই নামি
উজানী উল্লাসে যেন ছোটো নুড়ি জলপথ ঘুরি,
তুমি সে-ঝর্ণারই বৃক্ষ, আমি যার শীর্ণ জলঝুরি ;
আমি যার বোধিবৃক্ষমূলে
বারেবারে ফিরে আসি ঢেউ তুলে-তুলে,

সেই বোধি ভুলি যদি, তবে কারো কুটিল চাতুরী
বিষকন্যা কাছে আনে—সে-আমি আমি না,
সে-মায়া সরাতে দূরে আমি তাই আহত আঙুলে
আনম্র প্রণতি আঁকি নিরুদ্ধ দুয়ার খুলে-খুলে :
আমার আকাশ তুমি, বারোমাস আমার আঙিনা।
তোমার নীলিমা থেকে পূর্ণিমার অজস্র ধারায়
হঠাৎ কখন দেখি দূরের পাহাড়ে
সব গ্লানি মুছে গিয়ে গান হয়ে যায়,
হাওয়ার তানপুরা বাজে, সেই সুর জলের সেতারে
ভেঙে গিয়ে নদী যেন সাগরের জীবনময়ী মৃত্যুতে হারায়—
হিমন্ত জড়তা মুছে হে আমার প্রাণবন্ত আনন্দপ্রতিমা
পাহাড়ে-পাহাড়ে জাগো চূড়ার লাবণ্য তুমি ধ্যানধবলিমা।

আমিও আল্‌পনা আঁকি কল্পনার বাঁকে-বাঁকে ফিরে
আনন্দ ছড়াই নদীনীরে।
অথচ তখনো দেখি মানুষের স্তব্ধ শাদা হাড়
প্রতিবেশী পরিখায় আরো-এক স্তম্ভিত পাহাড়
গ'ড়ে তোলে, ভরে তোলে শ্বাপদের হোমের সমিধ—
চিতার তৃষ্ণায় জ্বলে শতাব্দীর প্রেমিক শহীদ।
এইভাবে ধ্রুবব্রতী সব প্রতিজ্ঞার
প্রদীপ স্তিমিত হয়, আর যত প্রেতের সুহৃদ্‌
মলিন মৌতাতে মাতে নির্লজ্জ নেশায় তাকে ঘিরে।

আমার চেতনা তাই বেদনারই এক নামান্তর :
আমারি জীয়নমন্ত্রে জীবন্মৃত এই যে প্রান্তর
সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলার ফুল্ল সুষমায়
কাল যদি ভরে ওঠে, তবে তার নিহিত ভাস্বর
যে-অমৃত সে তো তুমি, আজো যার অপার ক্ষমায়
পৃথিবীকে বুকে টানি।
দিকে-দিকে মরণের চর,
মহেশ্বর জাগি আমি, অতন্দ্রিত পদ্মবীজমালা
এখনো গৌরীর হাতে, আমি তার বিষণ্ন নিরালা
দুহাতে অঞ্জলি ক'রে আমারি আকাশে দিই, তুমি যার উদ্ভাসিত উষা
তামসী আমার গৌরী, তাকে দাও আলোর শুশ্রূষা॥

নির্জন দিনপঞ্জী

শুভ্রা বৈশাখ সকাল॥

আকাশ জেনেছে, মাটিও শুনেছে আমি-যে করেছি আত্মগোপন!
আমি আজ তাই প্রবাসী আকাশে
হাওয়ায় হাওয়ায় ঘাসে আর ঘাসে
নিজের মনের নিরালা বৃক্ষ করব রোপণ;

পিছনের যারা পিছনেই থাক,
শুনব না আর কারো পিছুডাক—
সাড়া-না দেবার শপথ না হয় না হোক শোভন।

গোধূলি।

ট্রেন থামল শিমূলতলায়,
নামলাম নিজেকে নিয়ে। প্রশ্নাতুর স্টেশনমাস্টার:
'অমুকবাবু তো আপনি? সেন-সাহেব আত্মীয় আপনার?
তাহলে আপনার সঙ্গে আমারো তো গলায়-গলায়,
আপত্তি-ওজর নয়, হতে হবে অতিথি আমার।'
ঈষৎ সৌজন্যে কেঁপে-কেঁপে
জানালাম অতীব সংক্ষেপে.
'অশেষ কৃতজ্ঞ, কিন্তু বলুন তো পান্থশালা এখানে কোথায়?'

রাত্রি॥

ছুটি মাত্র দুটি দিন, তারপর শহরের ঋণ
তিলে-তিলে আমাকেও শুধে দিতে হবে;
হে মৃত্তিকা, হে আকাশ শেষবার কথা রাখো তবে,
আমার দুহাতে দাও দুটি দিন প্রতিশ্রুতিলীন:
একটি ভাস্বর হোক, যে আমায় বিপুল বৈভবে
নীরবে উত্তীর্ণ করে—আরেকটি অঙ্গারমলিন
হোক, তাতে ক্ষতি নেই, আমার আশার কোনো প্রতীক্ষার পূর্ণ প্রণিপাতে
হৃদয়ের সহচর সময়ের হাতে
সে-অঙ্গার অবশেষে হীরক হবেই।

৪ঠা বৈশাখ, ভোর॥

এই সকালের আড়ালে কি কোনো তামসী রাতের
অন্ধকারের প্রস্তুতি নেই?
নির্জন থেকে জন্ম যে-সব সোনালিমায়ার কুহেলিকাদের
এ-সকাল মাতে তাদের সঙ্গে প্রদক্ষিণেই।

শ্বেতকরবীর বুক জুড়ে ওই একটি শালিক
বসে আছে যেন ঐন্দ্রজালিক।

আর তাই বুঝি ঈর্ষাপ্রখর প্রজাপতিটার
মাতাল পালকে হাওয়া ছুঁয়ে যায় চপল গীটার—
আমারো চিন্তা আমারো অঙ্গ
হোক তবে আজ হাওয়ার সঙ্গে অন্তরঙ্গ।
সেই হাওয়া ফের ছোট্ট দীঘির
শাপ্‌লায় গড়ে নিলাজ খুশির নিপুণ শিবির,
আবার হঠাৎ আড়ালে বাজায় জলতরঙ্গ,
সেই সুর নিয়ে ছিনিমিনি খেলে
রোদ্দুর আঁকে জলছবি নয়, জীবনের ছবি জলের ইজেলে-
হোক তবে আজ আমারো চিত্ত আমারো অঙ্গ
জলের সঙ্গে আলোর সঙ্গে অন্তরঙ্গ।

নিরালা নিখিল, সব-কিছু দাও,
মৃত্যুর সুরা, জীবনসুধাও,
আর তারপরে দ্বিগুণ অর্ঘ্য অর্চনা নাও।

দুপুর॥

সারাদিন আমি এক দুর্বিবহ রহস্যের পাশে
দাঁড়িয়ে রয়েছি একা। যে আমাকে দূরের প্রবাসে
নির্বাসন দিয়ে সুখী, দীপ্ত সেই রহস্যময়ীর
চেয়ে বুঝি এ-রহস্য আর গাঢ় অতল গভীর,
এবার আমাকে তাই কিছুতেই মুক্তি দেবে না সে,
আমি তার নদী আর সে আমার নম্রনদীতীর ;
নম্র সে, নিষ্ঠুর তবু আমাকে সর্বদা ঘিরে রাখে,
আমি যদি যেতে চাই দূরতর সাগরের ডাকে,
আমার অনন্ত গতি সীমন্তে সিঁদুর ক'রে আঁকে।

ওখানে আশ্চর্য এক দরদী নদীর
বুকের দর্পণে দোলে পুরাতন দ্বাদশমন্দির।
আমারো হৃদয় এক নদী,
আমার জীবন তবে এখনো হল না কেন মন্দিরের মতো মহাবোধি ?

মন্দিরের পাশে এক মাঠ,
দিগ্বলয় হতে আরো আরো দীর্ঘ মনে হয় যাকে,
হাট বসেছিল কাল, আজ তার বিষণ্ণ বিরাট
শূন্য বুকে ঘুরে মরে একা একটি মা-হারা বাছুর,
সমস্ত দুপুর
খুঁজেছে সে মাকে,
তারপর শুয়ে আছে বটের ছায়ায় মৌন রৌদ্রভারাতুর।

বিকেল।

উদাসীন মেঘে মেঘে ফুটে আছে থোকা-থোকা
আরক্তকরবী :
সমস্ত আকাশ যেন গগনেন্দ্র ঠাকুরের ছবি।
ধানকলে কাজ সেরে এইবার ঘরে ফেরে
সাঁওতালি মেয়েরা ঝাঁকে-ঝাঁকে,
দাদারিয়া গানে-গানে সে-করবী তুলে আনে
খোঁপার ফণায় গুঁজে রাখে।
ভিড় থেকে স'রে আসি প্রবাসী আকাশে,
তবু কেন তার মুখ ভিড় ক'রে আসে ?
আরো দূরে পাহাড়চূড়ায়
দুই চোখ ডানা ক'রে মেলি,
ওখানে কে ব'সে আছে ? আমারি বেদনা যেন চন্দনরাঙানো লালচেলি,
ওই তো রাজর্ষি সূর্য দিনশেষে শরীর জুড়ায়,
মৃত্যুতে মরে না, সে যে নব সবিতার তেজে
দীপ্তি পায় দিন-থেকে দিন,
আমার বেদনা তবে এখনো হল না কেন সূর্যের মতন সমাসীন ?

সন্ধ্যা ॥

কে ছড়াল এই দুঃসহ মহানিশি ?
বিনিদ্র চোখ, নীরন্ধ্র নির্জনে
বাসনার বুড়ি ডাইনী গেল না সুদূর নির্বাসনে ?
অশান্ত মন। দিগন্তে তবু অপূর্ব উদাসীন
আপন আলোর পালঙ্কে লীন সুপ্ত সপ্ত ঋষি !

এই সকাল ॥

গত রাত্রি গেছে যন্ত্রণায়,
বিগত শোকের শিল্পী আকাশের কোণায় কোণায়
সোনার মাধুরী ছিঁড়ে শ্রাবণের মেঘের মতন
কুটিল কাজল আঁকল। হে নির্বাক, ওগো নিরঞ্জন,
তোমার প্রতিভূ যেন এইবারে ভৈরবী শোনায়।

দুপুর ॥

মাঠে-মাঠে ওই ঝুমুর ছন্দে কাঁপছে চাষীর জীবনশৈলী,
ওরে মন, কেন গেলিনে সেখানে, নিজের মনের গোপনে রইলি ?
ভুলে গেলি কেন কথা ছিল তোর সবার সঙ্গে অঝোরে মিলব :
সেই-তো আমার স্বর্গসাধন, সেই-তো আমার জীবনশিল্প !

বিকেল ॥

অজ্ঞাতবাসের সঙ্গী আমার দুজন—
একজন কোন এক দূর গাঁয়ে সতীশের পিসি,
আমাকে ভেবেছে তার পরম সুজন,
অতএব মেনেছি সালিসী :
সকলেই চেনে তার ভিটা,
সন্নিহিত ইঁদারার পাশের জমিটা

একান্ত নিজস্ব তার—পাড়ার সবাই সেটা জানে,
অথচ পিসির সঙ্গে সতীশের কলহ সেখানে।
কোলে-পিঠে গড়ে-তোলা সে-ই কিনা হিংসার প্রতীক?
সুতরাং সে-জমির কোন জন আসল শরিক?

অন্যজনা সাতাত্তর বছরের বুড়ি,
যেন এক প্রাণবৃক্ষ জীবনে-জীবনে শতঝুরি
ছড়িয়ে এখন ভাবে গুটিয়ে নিলেই ঠিক হত,
কারণ আজন্ম তার পুজো আর ব্রত
ব্যর্থ ক'রে ভগবান একমাত্র বয়স্ক ছেলেকে
নিজের স্বর্গের স্বার্থে নিয়েছেন ডেকে;
যখন ওপারে গেল একষট্টি বয়স ছিল তার,
বিধাতার কাছে গেছে, বুঝিয়েছে এ-গাঁয়ের লোক,
কী ক'রে ভুলবে সে তবু একে-একে একষট্টি বছরের শোক
শিরায়-শিরায় যার সাতাত্তর বছরের ভার?

আমি তাকে কী বোঝাই; তাকে আমি বলিনি কিছুই,
সে যখন ফিরে গেল নিরালা নীলিমা জুড়ে
আমার শোকের পাশাপাশি,
তার সেই শোক রেখে আসি,
অপার আনন্দ নিয়ে তারপর দুজনারে ছুঁই।
এই রাত্রি গাঢ় হোক তারপর দুটি শোক
খুঁজে নিক বীতশোক বীণ—
হে নির্বাক নিরঞ্জন তারপর এ-জীবন
ক'রে দাও সূর্যসমাসীন।

সেই সান্ত্বনা হয় যেন ধ্রুব:
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।

ছুটি শেষের রাত্রি ॥

আবার সেই ম্লান শহর, কালো গলি,
স্তিমিত গান, ওখানে যেন কোন অসুখ,
দুহাতে এসে ফেলেছে ঢেকে দিনের মুখ ;
কলকাতায় ফিরে চলি।
তবু নিলাম দুটি দিনের দুঃখসুখ,
নিরিবিলির ছায়ানিবিড় কথাকলি,
চূর্ণ হোক কলকাতার কালো গলি :
ব্যথার কুঁড়ি গানের ফুলে ফুটে উঠুক ॥

বন্ধুরা বিদ্রূপ করে

বন্ধুরা বিদ্রূপ করে তোমাকে বিশ্বাস করি ব'লে ;
তোমার চেয়েও তারা বিশ্বাসের উপযোগী হ'লে
আমি কি তোমার কাছে আসতাম ভুলেও কখনো ?

চারিদিকে অন্ধকার, দেখতেও চায়না ওরা কিছু,
কী-যেন দূরের শব্দে মাঝে-মাঝে সামনে গিয়ে পিছু
ফিরে এসে বলে ওরা শোনেনি দূরের শব্দ কোনো।

ওরা কেউ কারো নয়, ওরা ঘরে-ঘরে
মৃত্যুর অপেক্ষা নিয়ে প্রতিদিন মরে।

আমি যে কোথায় যাব, কখন···কোথায়···
এই ভেবে আমারো বেলা অবেলায় যায় ডুবে যায়।

এখনো তোমাকে যদি বাহুডোরে বুকের ভিতরে
না পাই, আমাকে যদি অবিশ্বাসে দুই পায়ে দ'লে
চ'লে যাও, তাহলে ঈশ্বর
বন্ধুরা তোমায় যেন ব্যঙ্গ করে নিরীশ্বর ব'লে ॥

পটভূমি

গ্রাম থেকে এসেছে সোজা যে-ছেলেটি নিমাই-সন্ন্যাসে
নিমাই সেজেছে পরশু, বৌকে সঙ্গে নিয়ে এই প্রথম
কলকাতায় এল, কিন্তু বধূটির রকমসকম
গাঁয়েরই মেয়ের মতো—এই দেখে ময়দানের ঘাসে
অবিকল ঘাস হ'য়ে গেছে সেই নকল নিমাই।
সামনে এসে বিচলিত ছেলেটির মুখপানে চাই,
আবার নেহাৎ যেন ভুল ক'রে ফেলেছি ভুলোমনে
এইভাবে স'রে এসে যাই ঠিক পিছনে-পিছনে ;
সন্ত্রস্ত অর্থাৎ সেই সপ্রতিভ ছেলেটি এদিকে
চৌরাস্তা পেরিয়ে গিয়ে সামলে নিল সাটিনের শার্ট,
ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ভাবে যাত্রায় নেবে না আর পার্ট।
ট্র্যাফিকের ঢেউয়ে ঘূর্ণী থম্‌কানো গাঁয়ের মেয়েটিকে
সচেতন ক'রে গেল দোতলা বাড়ির মতো গাড়ি,
ওধারে পৌঁছেই তার মুখ থেকে মিলিয়ে গেল হাসি,
আর পিছু-পিছু নয়, এইবার প্রায় পাশাপাশি
দাঁড়িয়ে শুনেছি স্পষ্ট বলে সেই নারী :
'শুনছ! তুমি যা-ই বল, আমাদের গাঁ অনেক ভালো,
এ যেন কেমনতরো, কেন জানি ভয় ভয় করে,
ও যেন কেমনতরো সারি-সারি ভয়-ভয় আলো,
পায়ে পড়ি, ফিরে চল আমাদের গাঁয়ের শহরে—'
এই ব'লে নিয়নের সহস্র মশাল দেখে ডরে
পটের ছবির মতো মেয়েটি হঠাৎ সুগোছালো
বেণীর সুষমা ভেঙে বিদেশী বোঝাই কালীঘাটে
ঝড়ের সাহস নিয়ে হাঁটে!

বটের বদলে বকুলগাছের জবানবন্দী

চলত ফিরত, নীলচে সবুজ মার্বেলে তার
তর্জনী আর বুড়ো আঙুলটা কেমন ঘুরত
রুদ্রাক্ষের মালার মতন, যেন সে-মালার
দেবতারা সব মন্ত্রমুগ্ধ, মন্ত্রমূর্ত।

চলত ফিরত, পুরোনো কাগজ পাতার টুকরো
পথে দেখলেই কুড়োতে চাইত, কখনো কিন্তু
কুড়িয়ে নিত না, তার কাছে সব ভীষণ শুভ্র,
পাহাড় অটুট, সব সমুদ্র সপ্তসিন্ধু।

মাঝে-মাঝে তবু ক্লান্ত লাগত, দূর থেকে ছুঁয়ে
তৃপ্ত হত না।   ভগবানকেও ছুঁয়ে দেখবার
পরখ করার সাধ হত তার, লোভ হত তার
আপাত আলোর প্রদীপ নেভাবে কালো এক ফুঁয়ে।

মাঝে-মাঝে তার নীলচে সবুজ মৃদু মার্বেল
ছুঁড়ে দিত দূর শূন্যের মেঘে, নাচাত সময়,
যেন আকাশের যকৃতে এক ভরাট আপেল
এখুনি রাখবে, মানুষের যেন মৃত্যু না হয়।

আবার কখন বিনয়ে মেদুর দেখতাম তাকে,
যেন কোনো তাঁবু গোপনে ফেলবে, গড়বে সে এক
নতুন শহর, সবাই বলবে ওরে ছাখ্, ছাখ্,
কে এসে হঠাৎ জাদু করে দিলে পুরোনো পাড়াকে···

আর কিছু আমি জানি না, জানার দরকার নেই,
কিছুদিন হল দাঁড়িয়েছি আর দাঁড়িয়ে দেখেছি,
আমি শুধু দেখি আমার শরীর ফুল ফোটালেই
আমি শুধু জানি একটি শরীর চলত ফিরত ॥

শিশুমহল

ও শিশুমহিলা, আমি এ-পার্কে তোমায় প্রতিদিনই
দেখেছি আমার ভাই পিণ্টুর সঙ্গে ; ক্রীড়নক
আমারো হৃদয় যেন তোমার দুখানি হাতে, ঋণী
তোমার দিঠির কাছে। হাল্‌কা গোলাপী হল্‌দে ফ্রক
লাল নীল রিবন আর সেলুলয়েডের কুরুবক
ব্যবহার করো তুমি। মাঝে-মাঝে মিণ্টু-রুবি-মিনি
খেলায় যোগ দেয়, তুমি বাধা দাও না। হাওয়ায় অলক
সূর্যকেও প্রভাবিত অপ্রতিভ করে, বিজয়িনী!
তোমার প্রহরী এক পুরুষ দেখেছি, প্রৌঢ় তিনি।
বাবা কিংবা মেজোকাকা—কি রকম সে অভিভাবক?
হে শিশুমহিলা, তুমি কবে হবে পিণ্টুর গৃহিণী?

অমৃতরূপা

আমি তাকে শহরের উপকণ্ঠী আকাশের দিকে
নিয়ে গিয়ে দেখালাম অন্য পৃথিবীকে :
'চেয়ে ভাখো, সূর্যকেও ভিক্ষার আধার ক'রে ওই
প্রসন্ন ভিখারী ছোটে নীলাকাশ—তোমারো প্রণয়ী
এইভাবে ছুটে যাবে তোমার জীবনপাত্রটিকে
দুই হাতে তুলে নিয়ে ভূমার সমীপে ;
তবু দূরে
একা তুমি যেতে চাও, কেন যেতে চাও, বিশ্বময়ী?'

এই অভিমান শুনে তখনি সে চ'লে যাবে দেখে
উপনগরীর পথে শব্দের শায়ক ছুঁড়ে-ছুঁড়ে
আবার তৃণের চোখে নীরবতা রেখে
তার চোখ ফেরালাম দূর মালঞ্চের অভিমুখী :

'তবে তুমি চেয়ে ছাখো একটি নিষ্পাপ প্রজাপতি
মধু-র সাধনা ভুলে অচিন পুষ্পের বৃন্তমূলে
চুপিচুপি দিচ্ছে আরতি ;

স্তোত্রের গোপন ইচ্ছা আকাশের গ্রন্থি খুলে-খুলে
পূর্ণের প্রাসাদচূড়ে উঠে গেল বেদনায় সুখী।
পূর্ণের প্রাসাদচূড়ে এক লক্ষ প্রাণের চড়ুই
আশার বিতানে রাখে রোদ্দুরের জুঁই।
আবার তাকাও নিচে : রৌদ্র বেয়ে অদ্রিকর্ণী লতা
কোথাও উত্তীর্ণ হবে ব'লে
স্থিরলক্ষ্য চলে ওই, রৌদ্র তারো আশ্রয়, তাহলে
তুমিও আমাকে ঘিরে পেতে পার পরম পূর্ণতা।'
এইবার চেয়ে দেখি আমার দুহাতে তার মন
কিছুই না পেয়ে ফেরে, জেনেছে সে আমার অমিয়
তরল তৃপ্তিরই মতো, এবারে সে আত্মনিবেদন
চকিতে ফিরিয়ে নিল, তীব্র শীর্ণতায় সত্যপ্রিয়
অনামিকা থেকে তার প্রথম চৈত্রের অঙ্গুরীয়
ঝ'রে গেল প্রতিপন্ন অপরাধী সাক্ষীর মতন।

সে এবার আমাকে দেখাল :
'তোমার আলোর অর্থ অগভীর আলো ;
যেখানে অর্কিডগুচ্ছ মেঘের বালার্কমিনারেট
ছুঁয়ে আছে, সতীর্থা অতসী
তাকে ঘিরে ধ'রে আছে নম্র হলুদের দীপ্ত অসি,
তাদেরও আশ্রয় মাটি, তবু সেই মৃত্তিকাও মৃত,
কিছুটা বিস্তৃত হ'য়ে ওদিকে লজ্জায় মাথা হেঁট,
বুকজোড়া কি-ভীষণ ধরেছে ফাটল,
ওখানে একদা কোনো দীঘি ছিল, দীঘির ঈপ্সিত
কলসের অনুযায়ী জীবনের জল
যা এখন অনীশ্বর আকাশের কাছে
ধূমল বাষ্পের মতো বৃষ্টিহীন হয়ে বেঁচে আছে ;

শূন্য মন্দিরের চোখে এখন সমস্ত ধরাতল
চেয়ে আছে, পূর্ণের অভাবে
এসেছে জনতা,
ভুলে গিয়ে অদ্রিকর্ণী লতা
বিবর্ণ এসেছে এরা, বিবর্ণ থেকেই ফিরে যাবে ;
এদের এড়িয়ে অন্য ধ্রুবপথে মিলিত যাত্রার
কোনো অধিকার নেই তোমার-আমার ।
মুঞ্জতৃণ থেকে
যেমন শীর্ষের ফলা ছিন্ন করে উদাসীন ছেলে,
সেই নিষ্ঠুরতা জেলে-জেলে
আমার হৃদয় থেকে তোমার হৃদয় ছিঁড়ে ফেলে
মুক্ত হও, তারপর ব্যাপ্ত করো তুমিও নিজেকে—'
ব'লে সে আমার হাতে প্রথম চৈত্রের অপরাধ
আচম্বিতে রেখে একা ফিরে গেল, ঘরে ফিরে গেলে
স্মৃতির প্রতিভূ হ'য়ে উঠে আসে দ্বিতীয়ার চাঁদ
হাতে নিয়ে ভিক্ষুণীর ঝুলি
আমাকে অনাদি-অন্ত রাত্রির অনন্ত দিয়ে ঢেকে
দীক্ষা দিল, মুছে নিল প্রতীক্ষার রক্তিম গোধূলি ॥

সোনার বাংলা

মা তোমার চোখে বিদ্যুৎ যদি জ্বলে,
সেই আভা নিয়ে আকীর্ণ হব তমিস্র নদীজলে।
আমি তো দেখেছি সেই আভা নিয়ে বেহুলার খেয়া ভাসে,
ভেঙে-চুরে যায় মৃত্যুর পিঞ্জর,
কালের কুটিল জলের বাসরে আমিও লখিন্দর—
বেহুলা আমায় নিয়ে চলে আজো প্রদীপ্ত বিশ্বাসে ।

মরণের পথে চলি জীবনের দিকে ;
আমার ললাটে মৃত্যুঞ্জয়ী লাবণ্য দাও লিখে,
আমার বসনে বাসন্তী নয়, শুভ্র শরৎ আনো,
বৃষ্টির পরে ভাঙা ছাউনির নিচে
দুয়ারে দাঁড়াও, আনত দুচোখ আমার আশায় ভিজে,
শূন্য দুহাতে শেষরাতে বুকে টানো—

রাতের শিয়রে সেই প্রহরেই পূর্ণিমা হবে আঁকা
স্বপ্নে দেখেছি সে যেন আমার মায়ের হাতের শাঁখা ॥

রুমানিয় একটি দম্পতি

(২৮ চৌরঙ্গি, কলকাতা
৩১ মে থেকে ২০ জুন, ১৯৫৭)

সত্যি কি অতটা সুখী, বাইরে যতখানি
দেখা যাচ্ছে ? ভিন্‌দেশী ভদ্রমহোদয়,
রেশমি জরির টুপি তোমার শিরোপা বর্ণময়,
তোমার ভার্যার অঙ্গে সুনীল সিল্কের শেরোয়ানি।

বুঝলাম, অভিভূত হৃদয়ের খুশি
হৃদয়ে ধরে না আর, তোমার ভুরুতে উচ্ছ্বসিত
অধিকারবোধে মগ্ন ক্ষমার অমৃত
আভিজাত্যে উঠেছে পৌরুষি'

বুঝলাম, পুরুষের ভাগ্য যথা ভার্যানির্ভর
এর বিপরীতও সত্য, দুধে-আল্‌তা রং
দুইগুণ বিকশিত বিবাহের পর,
শঙ্কিতা প্রিয়ার স্থাখো রঙ্গিণী স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং।

আমার এদেশ আতিথেয়তার সৌজন্যে বিদিত,
দেখে যাও এদেশের প্রমোদকুটির ;
নারীর মহিমা শোনো পুরুষের মুখে সুকীর্তিত —
আরো দেখে যাও দশা, নারীটির আর শিশুটির।

এখানে পার্বতী ব'লে একজনা কবে
নেচে উঠেছিল এক পুরুষের পাশে ; নৃত্যরতা
সে হঠাৎ থেমে গেছে ; উতল শৈশবে
শিশুটির মুখে দ্যাখো প্রতিহত প্রহত প্রৌঢ়তা।

তাই তোমাদের দেখে আমার সন্দেহ বদ্ধমূল
হতে চায়, আমিও কি তোমাদের দেখে
তাকাতে পেরেছি সুস্থ সপ্রতিভতায় চোখ রেখে ?
সত্যি কি তোমরা ভাব মৃত্যু নেই, পারিজাত ফুল

আছে ব'লে ভাব ? যদি সত্যি মনে হয় মৃত্যু নেই,
পারিজাত ফুল আছে, তবে কেন জীর্ণ এই দেশে
এসেও দাঁড়িয়ে আছ স্থির পুতুলের ছদ্মবেশে,
সীমাবদ্ধ হয়ে আছ পুতুলের প্রদর্শনীতেই ?

সুস্থ যন্ত্রণা

দ্রুপদী দুঃখের পাহাড়ে বোসো,
দুঃখ চারিদিকে জলের মতো,
শুধুই মুছে যায় বিধুর অভিমান,
প্রেমিকমাত্রেই অপরিণত।

তোমার কাছে কারো বিশেষ দাবি,
এখনো তুমি আছো তোমার ঘরে,
সুযোগী নির্বেদ সবার ঘরবাড়ি
একটি নিশ্বাসে দখল করে।

রক্তবীজ বুনে সবার পাপ
মঞ্জরীর মতো দ্রুত ছড়ায়
তুমি কি ভুলে যাবে আস্থায়ী'র সেই
সুস্থ যন্ত্রণা অন্তরা-য় ?

তোমার কাছে কারো বিশেষ দাবি,
বাইরে সারাদিন রৌদ্র ঝরে,
চৈতী চামেলিকে বাঁচাতে চাও যদি
শীতেও থেক তুমি তোমার ঘরে ॥

মেয়েটি

দ্রুতপায়ে যে-মেয়েটি ভিড়ের ভিতরে মিশে গেল,
ভালো ক'রে ওকে আমি দেখিনি যদিও,
ভালো ক'রে ওকে আমি জানি।

জানি এই মেয়েটিও অন্যান্য মেয়ের সঙ্গে এক।
সে যখন ঘরে যাবে, গিয়ে যদি দ্যাখে
অন্য কোনো গূঢ় অপমানে তার দয়িতের মুখ
অন্ধকার হয়ে গেছে, সেই কালো মুখের মহলে
ক্ষুধিত পাষাণে যাবে সারারাত্রি কেবলি যাবে ও,
আলো জ্বেলে-জ্বেলে।

আর যদি দ্যাখে ছেলেটিকে
অন্য-অন্য ছেলের মতোই
দিনের কঠিন যুদ্ধে জ্বেলে যেতে যেতে
প্রেমের সত্যকে ভুলে দগ্ধ এক অতৃণ প্রান্তর—
ও যাবে শিশিরভরা চোখে সেই অতৃণ প্রান্তরে
ছায়া ফেলে-ফেলে ॥

পথে-বিপথে

'শহরতলিতে এই ক'বছর আছ তো অলোক,
এ-কাজে ও-কাজে তুমি সারাদিন যেখানেই হোক
ঘুরে-ঘুরে থাক, তবু ঘুরে-ফিরে এখানেই ফেরো ;
আনোয়ার শা' রোড রাত্রে দূর থেকে বিদ্যুতের চোখ
জেলে তোমাকেই দ্যাখে, তোমার নিভৃত অলোকেরও
আলো আর অন্ধকার বিশ্লেষণ করে।

তা না হয় হ'ল, তবু এই ক'বছরে
কেন ভুলে গেছ তুমি ছিলে কোন্ শহরের লোক ?'

শহর নাকি সে কোন্ পাড়া-গাঁ,
জানিস্ মাগো কী তার নিশানা ?
কোন্ জনমে সেখানে তোর রাত্রি ভ'রে জাগা
হয়েছে শুরু—রাত্রি শেষ হলে
শীতের ভোরে যে-মাঘমণ্ডলে
শূন্য থেকে আমাকে তোর আঁচলে তুলে আনা ?

আমায় কেন আঁচলে তুলে আনা ,
আমি তো জানি রাত্রি হবে যেই
আঁচল থেকে আমায় দিবি শূন্যের হাতেই !

কবিতা কেন তবে, কী হবে গান ?
কালের মহাকালী, তোকেও চিনি,
তুই যে বিস্মৃতিনিশীথিনী,
বৃথাই তোর বুকে মাল্যদান।
লিখেছি গান আর গেয়েছি ঢের,
ভাবিনি থেমে যাবে আমার আঙুল,
আমার এই স্বর কৃতান্তের
শিকার হবে, ছাখ্ মূর্খ বাউল :

হইল হাটের বেলা, না হইল বিকিকিনি,
মাথার উপরে ছ্যাখো আইল দিনমণি।'

'উত্তর দিলে না তুমি আমার প্রশ্নের,
স্পষ্ট ক'রে শোনো তবে ফের,
যে-শহরে তোমার অঙ্কুর,
তার শান্ত লোকালয় থেকে কতোদূর কতোদূর
এসেছ এখন তুমি, জানো ?
না-ই যদি জানো তবে মিথ্যে এই কবিতা বানানো।
তোমার রাত্রির নিচে নিহিত যে-আলো,
তাকে চরিতার্থ ক'রে শূন্য সে-শহরে যাওয়া ভালো।
একথা বোঝনি যদি, কেন তবে এ-মর্ত্যনিখিলে
মা:ক ও প্রিয়াকে ডেকেছিলে ?
যে-তুমি এখানে গান বেঁধেছিলে, সে আরেক লোক!
যে-তুমি ওখানে আছো তার শিশু নয়নের নীলে
উনিশে শ্রাবণ রাত্রি রাখে আজ অবারিত শোক—
শহরতলিতে আর কতোদিন থাকবে অলোক ?'

ফিরোজাবাদ স্টেশন থেকে

স্বচ্ছ এই শালিখের মতো
কবে হবে আমার হৃদয় ?
হার মেনে হয় না আহত,
নিয়তি করে না যারে ক্ষয়!

কখনো টিনের ছাদে ও যে
রোদ্দুরের জলে অবলীন,
সাগরিকা শালিখ সহজে
পার হল ঢেউ-কাঁপা টিন।

আবার কঠিন ধরণীতে
নেমে এসে রোদ্দুরের ধান
বিশ্লেষণে করেছে প্রমাণ
শক্তি ওর শিরায়, শোণিতে।

অন্যদিকে অনেক চড়ুই
শালিখের বিপরীতগামী;
শালিখ, আমাকে বল: 'তুই
সঙ্গে আয়;' সঙ্গে যাব আমি।

চড়ুই তো একটু হিংসুটি,
আরো হিংস্র আমার শত্রুরা
শিখে নিই তোমার ভ্রূকুটি:
সমাহিত ক্ষমতার চূড়া।

আমি যদি আমার অধর
ক'রে রাখি তোমার আভাসে,
জানি তবু আমার সমর
ফুরোবে না অত অনায়াসে।

তোমার পৃথিবী থেকে আলো
নিয়ে তো আমারো পৃথিবীর
শান্তি ছিল, কে তাকে শেখাল
বেয়নেট, কামান, শিবির?

আজ আমি জেনে গেছি সীমা,
সুরের অভাবে হৃবিভ্রান্ত,
কী ক'রে তোমার মতো পাব
পালকের তৃপ্ত ধূসরিমা!

সেই পালকের অন্বেষণে
কাজ নেই, আমি ভেঙে যাই
জীবনের উৎরাই-চড়াই;

আপাতত আরেক স্টেশনে
যেতে হবে, তোমার শরিক
হতে আমি পারিনি, পারব না
শালিখের উদার সান্ত্বনা :
প্রান্তরের সামান্তরিক,
দিগন্তের বিস্তৃত বিষয়,
নিরন্তর নীলাম্বু সৈকতও.
কবে হবে আমার হৃদয়
স্বচ্ছ এই শালিখের মতো ?

মানবী মাধবী এক মানুষের কাছে

আমার স্বপ্নের মধ্যে পাশের বাড়ির মাধবীকে
কে আনল জানি না, কোনো দরজা বুঝি ভেজানো ছিল না ;
আমার স্বপ্নের মধ্যে মাধবী আমার হাত ধ'রে
অধরে ছোঁয়াল, বলল : কথা রাখো, আমাকে নিয়েও
একটি কবিতা লিখবে, কথা দাও, আমার অধরে
একবার কথা দাও এ-জীবনে একটি কবিতা
আমাকে নিয়েই লিখবে ; এমন-কি তোমার প্রিয়ার
প্রবেশ অনধিকার সেই কবিতায়। তুমি কেন
আমাকে এমন ঘৃণা কর, কেন মিথ্যে ভয় পাও ?
আমিও মানুষ, আর মানুষ না তোমার বিষয় ?
আর আমি উপেক্ষিতা, অন্তত সহানুভূতি দিয়ে
আমাকে বাঁচাও, তুমি অন্তত সহানুভূতি নিয়ে
আমার ঠোঁটের নিচে কথা দাও তুমি যে আমাকে
নির্বাচিতা ক'রে নেবে অন্তত তোমার কবিতায়।
তোমার প্রিয়ার মুখ পাশ ফিরল দেখে ভয় কর ?
ভয় কোরোনা ওগো, আমি ভোর-না-হতেই চ'লে যাব॥

প্রবর্তক

কী মেঘ দেখালে নিজে মেঘের আড়ালে ব'সে,
নিজে তো দেখলে না তুমি মৃদু স্বভাবের দোষে ;
শিরায় শিরায় দিলে টান—
চামরদোলানো মেঘে অতসীজড়িত যূথী ;
যদি কথা ব'লে উঠি যদি গান গেয়ে উঠি,
ক্ষমা কোরো, স্থির ভগবান ॥

যদিও মৃন্ময় সবি

কালো ছায়া, দুই দণ্ড তিন দণ্ড দাঁড়াও চৌকাঠে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছাখো : মাটির শরীর সিঁধ কাটে।

যতক্ষণ শ্বাস আছে ততক্ষণ আশ
অধিকারসূত্রে পাওয়া খদ্দরের জামার খদ্দর,
বাবার শরীর বেয়ে ঠাকুমার ষষ্ঠীর বাতাস।

হাতে যতক্ষণ আছে কলমের জোর,
স্পষ্ট জানি বাংলাভাষার কিছু শব্দের অভিধা,
লিখিতে পারব লিখব নীরোগ কবিতা,
ছিঁড়তে পারব ছিঁড়ব ছায়ার কাপড় ॥

কল্পান্ত

আরো হয়তো রাত্রি হবে। তুমি এই নীল নভে
কুয়াশার পায়ে
আশাকে নূপুর ক'রে বিনিদ্র প্রহর ধ'রে
পুব-বারান্দায়
একা সেই শব্দ শোনো, আবার প্রহর গোনো ;
এখনো অন্তত

এই প্রত্যাশা তো আছে,   প্রত্যাশায় সবি বাঁচে,
তার স্পর্শে যত
যন্ত্রণাও যুথী হয়,   তুমি এই দুঃসময়
অস্বীকার করে হও স্বরভিত অপেক্ষায় নত।
হয়ত আরও রাত্রি হবে ;   পুব-বারান্দার টবে
নববধূ সেজে
জুঁইমল্লিকারা আরো   ভরে থাকবে, কুয়াশারও
আবছা সরে গেছে,
সকলের পৃথিবীতে   ভোর এল ভরে দিতে
তুমিও সোহাগে
তারে দিতে গেছ ভরে   রৌদ্রকে তিমির করে
সে আরো গভীর ডাকে রেখে গেছে পিছনে তোমাকে ॥

এ-বাসনা বোধিসত্ত্ব

আমি হই অনুধ্যানী অশ্বত্থের মত মগ্নব্রতী
আমার নীলিমা হও, ডালে-ডালে ঝরাও প্রণতি।

যেখানে দাঁড়াই আমি, মাটির স্বভাব প্রতিকূল,
তবু ছায়া করে রাখি, আমার ছায়ায় অন্যফুল
ফোটে, বড় হয়, দেখি হাওয়া থেকে হাজারো অঙ্গনা
তাকে আলিঙ্গন করে, ফুল তবু আশ্বস্ত হল না!
আমার আশ্চর্য লাগে বড়ো।

আমার শরীর তুমি বুদ্ধের মতন শীর্ণ করো
দীর্ঘ অপেক্ষায়, তীব্র অনাদরে। সে-অবমাননা
আমার আবক্ষ দেবে হোমের যন্ত্রণা, বৃক্ষমূল
সম্পূর্ণ নতুন করে অন্যফুল ফোটাব, সে-ফুল
দুঃখের বিভূতি ভুলে তোমাকেই করে যদি দাবি
তাকে তুমি ফেরাবেনা, একথা যখন আজ ভাবি
আমার আশ্চর্য লাগে বড়ো॥

সাড়া

আশ্বিনের আকাশতলে তোমায় কী যে বলেছিলাম
গিয়েছ তুমি ভুলে,
নিরঞ্জন মেঘের থেকে নিরভিমান আলোর ঝুরি
নামিয়ে দিয়ে তোমার শ্রুতিমূলে
বলেছিলাম, 'রাত্রি ছাড়া ভুবনে নেই অন্য কিছু আর ;
যেটুকু আজো শুক্লা আছে, বিবর্ণ বিভার,
প্রতীয়মান ঢেউয়ের মতো বালির সাদাখাড়ি ;
এখানে যদি ত্রিলোকদীপ না জ্বেলে দিতে পারি,
পাতাল থেকে মুক্ত ক'রে না আনি ভোগবতী,
উপর থেকে অমরাস্রোত না আনি আমি যদি
উপর দিকে না নিতে পারি মন্দাকিনী ধারা,
আমার হাতে দিয়োনা আর দিয়োনা তুমি সাড়া।'

বছর ঘুরে আবার আমি এসেছি আশ্বিনে,
নিখিল ঘুরে এসেছি, দেখি, তেমনি তুমি আজও
উন্মীলনী নদীর মতো অশ্রু মেলে আছ,
যে-নদী এই পৃথিবী নামে নিঃস্ব গ্রামখানি
মায়ের মত মাধুরী ঢালা জলের রিনিরিনে
ভরবে বলে শুনিয়ে যেয়ে সান্ত্বনার বাণী :
'ত্রিলোকদীপ জ্বালিয়ে সে যে তোদের নেবে জিনে।'

ত্রিলোকদীপ জ্বালিনি আমি, পারিনি জ্বেলে দিতে,
শূন্য হাতে এসেছি আজি তোমার গ্রামটিতে,
আমার হাতে তোমার হাত করুণা হয়ে লোটে,
নিলাজ আমি, কাঁদিনি তবু, নিবিড় সঙ্কটে
মরিনি, শুধু বলেছি, 'ওগো আমার গ্লানি ঢাকো,
তুমি এবার আমার প্রাণে প্রতিশ্রুতি রাখো।

অক্ষমের অতল ক্ষতি অন্বেষণে মুছে
এবার তবে তুমিই আনো ত্রিলোকদীপ খুঁজে ;
একলা আমি রইব জেগে বাদলঘন রাতে,
আসবে তুমি প্রতীক্ষার শেফালিফোটা প্রাতে,
তখন যেন আমার সেই তীব্র অনুতাপে
অরুণাচল সিক্ত হয়, অস্তাচল কাঁপে ;

মরবে এসে আমার হাত তোমার দুই হাতে ॥'

মানুষ

আমার ঘরের আলো আমার টগরগাছের ডগায়
বাঁকা হয়ে পড়ল ; শুধু চাপা মুখের ওপর
একটু আলো; আর সমস্ত শরীর অন্ধকার ;
আঘোমটা অকুণ্ঠ গলায় হঠাৎ বলে উঠল :
'দাও আরেকটু আলো আমার চিবুকে দাও, আমার
বুকে আমার বুকের নিচে—না, না আমার কাছে
এসোনা, ঐ দুহাত দিয়ে আমার চিবুক তুমি
ছুঁয়োনা, এই মলিন বুকে তোমার ভীরু দুহাত
রেখোনা। ঐ ভ্যাখো ভ্যাখো আমাকে শেষ ক'রে
চলে যাচ্ছে কারা, ওরা মানুষ ? নাকি তোমরা
পুরুষ বলো ওদের ? ওরা কাপুরুষের অধম,
তা নাহলে স্পষ্ট করে চায়নি কেন, আমায়
আমার ঘুমের সুযোগ নিয়ে নষ্ট করে গেছে ?'

গিরিমাটির দেশে

ও গাঁয়ের লোক বলে সে এখনো পথের মাঝখানে।
তবে যে শুনেছ তার পায়ের মঞ্জীর ?
বৃষ্টি তার চরণের স্বরলিপি অবিকল জানে।

তুমি তবে পথে যাও, ঘুরে মর, বিজুরী অথির,
মরমী পবন মৌন, আছে শুধু জলদস্যু হাওয়া,
এখনো তোমার কাজ পথে-পথে ঘুরে-ঘুরে যাওয়া।

অভিমান থেকে ক্ষোভে, ক্ষোভ থেকে ক্ষমার নির্বাণে
যত যাও, ফের তবু ক্ষুব্ধ এই শ্রাবণের লোভে,
ক্ষমার নির্বাণ থেকে ফিরে যেতে হবেই বিক্ষোভে।

ও গাঁয়ের লোক বলে এসেছিল তোর খোড়ো ঘরের খিলা
—তুই ছিলি পথে—শুধু তারা তাকে সবাই দেখেছে,
কিন্তু তোকে ফিরতে দেখে সে গেছে, শহরে ফিরে গেছে।

এ গাঁয়ের ও গাঁয়ের লোক জমে তোমার দুদিকে।
সে কি তোকে ভুলে গেল নগরের ভিড়ের উজানে ?
বুকে ধরে রাখ্ এই মা'র মত ডুংরি নদীকে।

মা'র চোখে সন্ধ্যা নামে, দূরে গেল যে যার ডেরায়,
হাওয়া শান্ত হয়ে আসে, তারপর বৃষ্টি শেষ হলে
আমৃকয়া-গ্রামের পথে চ'লে

ঘুচে যায় সন্দেহের ভুল
'সে তোরে ভোলেনি' এই শান্ত হাওয়া তোকে বলে যায়—
সাঁওতালি পথেও ওরে তুই তার বাংলার বাউল ॥'

তুলসীতলা

কি করে যে অতটুকু ঘরের মধ্যে আছ।
বাইরে কত সমারোহ শালতমালের, কত
সমারোহ নানারকম ফুলের ; কত পাখির
হাট বসেছে বাইরে, কিন্তু সামান্য ফুলগাছ
ফুল বলে যা চেনা-ই যায়না অথবা গাছ বলে ;
তার ভিতরে অসামান্য শক্তিশালী রাখাল
তোমার বাঁশী, তোমার বুকের আড়াল-রাখা, তোমার
যশোদা আর সুদাম নিয়ে কেমন করে আছ ?

আমি তো বুঝিনি

বৃষ্টি ঝিকিয়ে উঠল, বৃষ্টি রোদ্দুর রেখে দিয়ে
মেঘের জানুতে ডুবে গেল। এক মুক্তবলাকাধারা
তার অসংখ্য বিকল্পা হয়ে নভোমণ্ডল ভাসায় ;
দেবদারু দুটি কে কখন কাকে আশ্লেষ করে ভাবে :
অনন্তমূল অশ্বত্থের সুনিয়ন্ত্রিত লজ্জা।

রোদ্দুর বেঁকে বসল, আবার জলের বক্ষে শুয়ে
জলকে পোড়াল। আমি তো বুঝিনি কখন এসেছে রাত,
আমি তো বুঝিনি বধির বিধাতা আমাকে দেবেন এত
দারুণ শক্তি, শান্তি, এমন শান্তির যন্ত্রণা :
কী করে যে আমি তোমাকে পেলাম মাতৃজঠর থেকে।

শেষের প্রহর

প্রথম দৃশ্য-সায়াহ্ন

স্বপন ॥ একদিন তোমায় বলেছিলাম
'যেখানে মৃত্যুর উপত্যকা
আমিই সেখানে একলা যাব
আপনার একতারা বাজাব,
তুমি থাকো অমৃতা অশোকা।

তুমি থাকো আমার ওপারে
মহামরণের অন্ধকারে
জীবনের ঝিনুক কুড়িয়ে
ফিরে এসে তোমার ডাকনাম
ধরে ডাকব—ধরাকে শুনিয়ে
গাইব সে-নাম বারেবারে।'

প্রত্যাহার করেছি সেই কথা,
সেকথা এই সমুদ্রের জলে
মেলে দিলাম—সেকথা ভেসে চলে,
দুঃখসুখ দুয়ের গভীরতা
যেখানে মেলে মালার শৃঙ্খলে,
মৃত্যু আর অমৃতমণিলতা
যে-শৃঙ্খলে মুক্তি হয়ে জ্বলে,
সেখানে এসো, পুরোন সেই কথা
রেখেছি এই সমুদ্রের জলে।

সুপর্ণা ॥ এই দীঘি এই জল—তাকে তুমি সমুদ্র বোলো না,
দীঘির ওপাশে দ্যাখো গোধূলি প্রণত হয়ে আসে,
আর শোনো দীঘির এপাশে
চন্দনাপাখির আলোচনা।

স্বপন ॥ তুমি এই চন্দনার ধ্বনি
শুনে দ্যাখো—তারা এই জলে
সমুদ্র দেখেছে, তরুতলে
হাতে নিয়ে ঢেউয়ের খঞ্জনী
'এ-দীঘি সমুদ্র'-ওরা বলে।

সুপর্ণা ॥ ক্লান্তকথিকার পর ওরা শুধু পাতার ঝালরে
তোমার-আমার ঋণ সুরের অক্ষরে শোধ করে।

স্বপন ॥ তাই বুঝি সায়াহ্নের সভা
ধন্য ক'রে সূর্যের কোরকে
ফুটে উঠল সপ্তমুখীজবা
যার নীচে শীর্ণ ওই সাঁকো
আর এই দীঘি—তুমি ওকে
একবার সমুদ্র বলে ডাকো।

দ্বিতীয় দৃশ্য সন্ধ্যা

স্বপন ॥ খেয়া বেয়ে মাঝি আসে যদি—

সুপর্ণা ॥ তার সঙ্গে যাব আমি যাব,
আরেক নাবিক আছে পরপারে গভীর দরদী
যার সঙ্গে তোমাকে মেলাব।

স্বপন ॥ সুপর্ণা যেয়োনা আরো থাকো,
দুহাত দিগন্ত করো প্রিয়,

আমার আঙুল থেকে পরো
সাগরের নীল অঙ্গুরীয়।
সুপর্ণা তোমার দুই হাতে
আমি আর আমার আকাশ
জীবনের শ্রাবণ জুড়াতে
খুঁজি এক আনত আশ্বাস ;
সুপর্ণা, যেয়ো না, কথা রাখো,
দাও স্নিগ্ধ কুসুমসকাশ।

তৃতীয় দৃশ্য-রাত্রি

সুপর্ণা॥ কার উপস্থিতি কাঁপে—কাঁপে ওই ইমনসন্ধ্যায়,
সে আমায় নিয়ে যাবে—যাবে দূর তারার শিবিরে,
সে তোমাকে ঈর্ষা করে—তার আগে তুমিই আমায়
নিয়ে চলো, ফিরে চলো পুরাতনী পৃথিবীর তীরে।

স্বপন। সে তোমার অনন্য প্রেমিক,
তার কাছে শূন্য হাতে যাবে,
সে তোমায় পূর্ণ করে দিক,
সে তোমায় চেয়েছে এভাবে।
লগ্ন আসে—তার লগ্ন আসে,
শরতের নিষ্পাপ আকাশে
সমাহিত প্রতীক্ষার ডাকে
সে-প্রেমিক পেয়েছে তোমাকে।

সুপর্ণা॥ যাও—এই মুহূর্তেই যাও,
মৃত্যু ওর নাম, ওকে মৃত্যু দিয়ে দূর করে দাও।

স্বপন। মৃত্যু—সে পূর্ণেরই অন্যনাম,
চেয়ে দ্যাখো তোমার প্রণয়
তার পায়ে উপনীত হয়,
রাখে এক নিস্তব্ধ প্রণাম।

অবসন্ন আলো আমি, আমার প্রণয় ধরো ধরো
দরিদ্র সে-প্রদীপ, করো নির্বাপিত করো।

সুপর্ণা ॥ আমি সে-প্রদীপ, তুমি—তুমি তার নির্মাণের মাটি
আমাকে নিঃশব্দে এই রাতের আকাশে তুলে ধরো

স্বপন ॥ অবৃক্ষসম্ভবা এই মাটি,
আর তুমি স্বর্গের মমতা,
এ-মাটির দীর্ঘ নীরবতা
ভেঙে তুমি অপূর্ব দোপাটি
নিয়ে এসেছিলে থরেথরে—
দূরের অঙ্গনা থাকো তুমি,
এসোনা এ-যন্ত্রণার ঘরে,
এ-অঙ্গন মরুমনোভূমি।

সুপর্ণা ॥ তুমি থাকো আমার এপারে
মহামরণের অন্ধকারে
জীবনের ঝিনুক কুড়িয়ে
আমি আসব।

এই শীর্ণ সাঁকো
ঘিরে তুমি আমাকেই ডাকো
অবিজিত স্মৃতির সংগ্রামে :
ছোটো এই সমুদ্রের নামে ॥

দূরবীক্ষণ

অন্য আলোয় আমাকে দেখবে তুমি।
এই মসৃণ মমতার সমভূমি
থেকে অন্তত কয়েক মাত্রা দূরে
যেখানে আকাশ আলোকলতার সুরে
সুর মেলায়নি, সেই লজ্জায় ঢালু :
এধারে খাড়াই, ওদিকে গভীর জল
দুজনেই তার সুনীল উত্তরীয়
ধরে আছে বলে দিগন্ত আলুথালু,
ভয়ে কাঁপে যত বিহঙ্গ বিহ্বল—
সেখানে আমায় পরীক্ষা করে নিয়ো।

আজকে তোমার সকল প্রশ্ন
হারিয়ে গিয়েছে আমার কথায়,
কথার কোমল সচ্ছলতায়
আছ অপরূপ নাতিশীতোষ্ণ,
নম্র সময় চামর বুলায়।

আমি দূরে যাব ; বিষুবরেখার ব্রতী
হতে পারব না—ওই আকাশের পাশে
নিজেকে পুড়িয়ে তোমার চৈত্রমাসে
রেখে যাব এক মধুর মেরুজ্যোতি।
তরুছায়াতলে এইখানে তুমি থাকো,
শান্তি তোমার সখী হোক শাশ্বতী—
ছোটো এই দীঘি, বাঁকা এ-কাঠের সাঁকো,
এই মধুকর সুখী এ-মাঠের ঘাসে,
কিশোর হাওয়ার পরিমিত পাগলামি :
পুরোন আলোয় তোমাকে দেখব আমি

একজন মৌলভী আমাকে

এ যেন গুল্মোর ডাল, আর আমি একটি বউল,
তার বেশি নই,
আমাকে বোলো না তুমি বোলোনা রসুল,
আমি ফুটে উঠি আমি পথের ধুলোয় পড়ে রই।

আল্লা বুড়ো আল্লা এই গুল্মোয়ের গাছ,
তাঁর খুব উঁচু ডাল মহম্মদ পয়গম্বর,
দুজন দাঁড়িয়ে, দেখি চাঁদ আর সূর্য দুই তাজ
তাঁদের মাথায়, কিন্তু আমাকেই নিয়ে যায় ঝড়।

খোদার ইমান আমি কখনো রাখিনি,
হিসাব দিতে যে হবে, আমায় অথর্ব
করে দেবে বলে যেন একজোট পাপের ডাইনী,
একা-একা দিনে আমি তিনবার নমাজ পড়ব।

দিনে তিনবার, আমি একবার দুই হাত তুলে
তাঁকে বুকে নেব, আমি তারপর হয়ে যাব শিশু,
তাঁর বুকে যাবো বলে একেবারে হয়ে যাবো নিচু,
আমি যাঁর একটি বউল, সেই একটি বউলে

তাঁর বুক ভরে দেব, আমায় কী ভাবো,
আল্লা, আমি হাসিমুখে হঠাৎ কবরে চলে যাব॥

সতীর্থ

ধীরোদাত্ত যাকে বল সেরকম এরা কেউ নয়,
বরং অন্যায় হত মহাকাব্য পটভূমি হলে,
তবুও দেখেছি আমি প্রতি সাঁঝে ত্রিকূটের কোলে
কোথা থেকে মুখ তোলে তিনটি হৃদয়
একটি আনন্দে কিম্বা একই দুঃখে সম্মিলিত হয়।

নায়ক না হক, তবু পরিশেষে তাই বলা চলে,
কেননা সবাই এরা নিজেদের গভীর মনন
প্রত্যহ অর্পণ করে কোনো এক শ্যামলীর সুনীল আঁচলে—
দুইবেলা দূর থেকে নিয়ে সেই জলের আরতি
উদাসী প্রতিমা তবু, উদাসিনী আত্মলীনা বৃক্ষের মতন।

এইখানে বলা ভালো চন্দনা সে-অঙ্গনার নাম,
সাঁওতালি বলেই তারো সারামুখে ঘন রাত্রিযাম ;
চন্দনার চোখে তবু অধরার অনারোহ জ্যোতি।

অন্যদিকে তিনজন মাঘুয়া, ভিখুয়া, মাতোরিয়া—
তিনপথে পার হয় দুর্বিষহ দিনের দরিয়া।
পাহাড়তলির শেষে মাঘুয়ার নিত্যনাগপাশ
ছোটো একটা কারখানায়, যেখানে সে মনিবের দাস।
ভিখুয়া অবশ্য কিছু স্বয়ম্বশ স্বাধীন প্রকৃতি,
নিজস্ব দোকান তার, উপজীব্য মহুয়া প্রভৃতি।
মাতোরিয়া ? আজও তার উপযোগী জীবিকার খোঁজ
মেলেনি, এখনো তাই রোজ
ভোলেনি সে সারাদিন বিজনবাঁশীটি নিয়ে খেলা
মাঠে-মাঠে এ-বেলা ও-বেলা।
প্রতিটি সন্ধ্যায় দেখি তিনজন অপরূপ গাঢ় :
প্রতিযোগিতার ঈর্ষা কারো মনে ওঠে না একবারো—
একে আরেকের হাতে হাত রেখে মোহানার মিলে
ঝিথিয়ার নিরালা নিখিলে

প্রথমে ত্রিকূটে পরে পঞ্চকূটে তারপরে সবগুলি টিলায়
পৃথিবীর মুখে চেয়ে অপার্থিব হিসাব মিলায় :
"কোন্ ছন্দে কী উপায়ে কোন্ মন্ত্রে কোথায় কখন
বাঁধা পড়ে চন্দনার মন ;
নাকি সে পড়ে না বাঁধা, সে এতই আশ্চর্য কৃপণ !
পাথরে উৎকীর্ণ পদ্মপাতা যেন চন্দনার চোখ,
কমলপত্রাক্ষ কন্যা, হোক সে-ও পাথরের হোক।
প্রাণের রুদ্রাক্ষে তবু তারি ছায়া বেঁধে রাখে ত্রয়ী :
চন্দনা বোঝে না আজও সে-আনন্দ সেই তীব্রশোক,
বোঝে না, তবুও সে-ই প্রাণময়ী সবজ্যোতির্ময়ী ॥"

একটি শবযাত্রা

স্পষ্ট আমি বলতে পারি ঐ
অন্তিম শয্যার শাদা আবরণী তুলে ফেলে কেউ
ভিতরে তাকাও যদি, দেখবে কোনো মৃতদেহ নেই।

তবে যে একদল কান্নাকীর্তনীয়া জলজ্যান্ত লোক
ঈশ্বরের ডাকনাম কাদায় লুটিয়ে চলে যায়
আমি বলে দিতে পারি ওরাই ছয়টি মৃতদেহ ॥

তিতিক্ষা

এইখানে দাঁড়িয়ে থাকো। এই অনুষঙ্গিণী কুয়াশা,
পথরেখাহীন মাঠ, শূন্যারোহী খদ্যোৎবাহিনী,
এ-মাঠেও লোক চলে, সারারাত একই লোক যেন
আসে যায় একই মাঠ পারাপার করে মনে হয়,
ভয় নেই, ভয় নেই, এরা কেউ তোমাকে চেনে না।

এ-রাত্রে কোথায় যাবে, এত রাত্রে কে তোমায় তার
ঘরে নেবে? তাছাড়া তোমাকে যদি পলাতক বলি
এড়াতে পারবে কি সেই অভিযোগ? এক নগরীর
অন্ধকার থেকে তুমি আরেক গ্রামীণ নগরীর
অন্ধকারে চুপিচুপি পালিয়ে এসেছ। আর, জান
পলাতক মানে প্রতারক? তুমি জননীর মতো
গভীর প্রতিভা পেয়েছিলে। তুমি জননীর মতো
রক্তসুধা দিয়ে যাকে আবার রচনা করেছিলে
সে তোমায় একবার অস্বীকার করে গেছে বলে
সে তোমায় একবার অপমান করে গেছে বলে
প্রতারক, তাকে তুমি সেই নগরের অন্ধকারে
ফেলে রেখে কোন্ মুখে চলে এলে? সেই প্রেমিকারও
আজ কোনো পথ নেই, চোরাগলি তার চতুর্দিকে,
বিবিধ শুভার্থী তার, তাকে নিয়ে প্রচুর জটলা।
তুমি স্বার্থপরতায় নিশ্চিন্ত, একাকী, নিশ্চেতন—
ভেবেছ নিজের পথ বিজন ক্ষমায় চলে যাবে!
আবার আরেকবার তুমি তাকে হৃদয়ে নেবেনা?
এখনো বুকের কাছে সে-ই আছে হৃদয়ে তোমার;
সপ্রতিভ চেয়ে ত্থাখো সে তোমার ভিতরে এখন
আঁধারে বিদ্যুৎ বোনে, সেই কম্প্রতড়িতের মানে
দিগন্তদীঘল পথ দুই চোখে জ্বালিয়ে একা-একা
অঙ্গনে তোমার জন্য বসে থাকা। একবার ভোরে
তোমাকে সে গ্রহের গতির পথে মেলে ধরেছিল,
বাহিরধরার দিকে দিয়েছিল ভাসিয়ে তোমাকে—
এখন অনেক রাত্রি, সে এখন তোমাকেই চায়।

এখনো ফিরবে না? তুমি স্মৃতিনাশা নদীটির স্রোত
যত ভালোবাসো তত স্মরণিয়া নদীর কূলেই
ফিরে-ফিরে আসো। তুমি যেখানেই যাবে তার মুখ
নমিত উদ্ধত শান্ত রুক্ষ প্রতিহত উচ্ছ্বসিত;

চিরকুণ্ডা মাঠের এই ঘাসের অভাবে সে তোমায়
প্রত্যাখ্যান করে, ফের চিরকুণ্ডা মাঠের পরপারে
সে ঐ পিয়ালশ্রেণী যে তোমার পথরোধ করে।
চলো, ফিরে চলো, ভাখো, রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে আসে,
যেখানে তাকাও তার প্রতিদ্যুতি—আকাশজবায়
তার ধনী অভিমান, মেঘে মেঘে শ্বেতকরবীতে
অভিমানজয়ী তার গ্রীবার আঙ্গিক তরঙ্গিত।
পথরেখাহীন মাঠে তার অশ্রুজল স্পষ্ট পথ
এঁকেছে! সে মানুষের পাতালচক্রান্ত পায়ে ঠেলে
আকাশের দিকে গেছে, বরাকর নদীটির সাঁকো
কাঁকনের মত তার একহাতে, অন্য হাত খালি,
তোমাকে না পেলে তার দুইহাত খালি হয়ে যাবে,
বরাকর নদীজলে হঠাৎ কাঁকন যাবে খসে।

রাত্রি শেষ হবে বলে ওপাশে কুলটির কলিয়ারি
শেষবার জ্বলে উঠল, তুমি আর জ্বলবে না কখনো!

কী বলতে হবে, কি করে বলতে হবে

কী বলতে হবে, কি করে বলতে হবে?
রৌদ্র যখন মুদ্রিত নীল নভে,
পঞ্চপাপড়ি সূর্য ওখানে যদি
ঘন আশ্লেষে উদ্যত, দ্রৌপদী
মেঘ যদি কাঁপে লজ্জিত গৌরবে,
কী বলতে হবে, কি করে বলতে হবে?

'ঈশ্বর নেই' হাওয়া দেয় টিটকারি।
'ঈশ্বর নেই' দিগন্তবিস্তারী
কালো হাওয়া ঘোরে; আলোর প্রবাহ চলে,
আর, যেতে যেতে অন্তিম শৃঙ্খলে

বাঁধা পড়ে যদি অচল হিমার্ণবে,
কী বলতে হবে, কি ক'রে বলতে হবে ?

মৃত্যু ঘৃণিত পঙ্গু শিশুর প্রতি
মা'র চোখে বয় ঐশী দৃশদ্‌বতী,
দয়িতার পাশে একবার তুমি, আর
পরমুহূর্তে ঈশ্বর, একাকার
তোমার সঙ্গে বোবা ঈশ্বর যবে,
কী বলতে হবে, কি করে বলতে হবে ?

আবহমান

একদিন হেমন্তের ভোর ভেঙে গেলে
হেমন্তবিকেলে
মৃত্যুর আগের মত শেষবার মেয়েটির মুখ
একটি মোমের তীব্র ক্লান্তিকমনীয় উজ্জ্বলতা,
জেগে আছে ম্রিয়মাণ মেহগনি কাঠের আধারে,
স্থস্মিত দৃঢ়তা ওঠে কপোলের সজল কিনারে,
মেয়েটির মুখে ফোটে কথা :
'আমি যাই। স্মরণ জ্বলুক।
স্মরণে জ্বলুক এই দিগন্তবিজিত মাঠ,
শিশিরের স্বল্পায়ু সাগর,
আমার দক্ষিণ করে সম্মোহিত তোমার ললাট,
শিথিল তৃণের মঞ্চে চপল ক্ষণের খেলাঘর
স্মরণী ছায়ায় এই পলাতক মুহূর্তের রূপ
চিরন্তনে পাবে রূপান্তর
আমার স্মৃতির ফুলে হবে তুমি অক্লান্ত মধুপ।'
ছেলেটি বলে না কিছু, বুকের নিবিড়ে,
মোমের মতন সেই মুখ রেখে পুরোন অভ্যাসে
ব্যর্থ করে সকলের আকাশের সন্ধ্যাতারাটিরে।

ছেলেটি শোনেনি কিছু। তারা গোণে নিজের আকাশে
তারপর হেমন্তবিকেল সরে যায়,
হেমন্তসন্ধ্যায়
মৃত্যু থেকে ফিরে এসে সে-মেয়েটি বলে :
"আমাকে ফেরালে তুমি কিসের কৌশলে?
মৃত্যুর চেয়েও গাঢ় বিস্মৃতির উদাসীনতায়।
যদি ভুলে যাও এই দিগন্তবিজয়ী মাঠ,
শিশিরের শাশ্বত সাগর,
আমার দক্ষিণ করে সমর্পিত তোমার ললাট,
ঘাসের ভিত্তিতে ঘন সত্য এই সুরের বাসর,
সেই ভয়ে ফিরে এসে তোমার আয়ুতে বাঁধি ঘর।'
ছেলেটি শোনেনি কিছু। বুকের নিবিড়ে,
মোমের মতন সেই মুখ রাখে সহজ অভ্যাসে।
সকলের আকাশের সন্ধ্যাতারা নামে তার নীড়ে।
ছেলেটি বলে না কিছু। স্থির জলে নিজের আকাশে॥

চিহ্ন

সারাটা পৃথিবী তুমি রেখে গেছ স্মৃতিচিহ্ন করে;
আমি ভয়ে ভয়ে থাকি, যদি কেউ করে নেয় চুরি
রাত্রিদিন জেগে থাকি, দিতে যদি একটি অঙ্গুরী
যে কোনো আঙুলে বেঁধে ঘুমোতাম আমি রাত্রি ভরে,
কাকচক্ষু তার জলে, তার শীর্ণ হীরার অক্ষরে
তুমি শুধু জেগে রইতে, তুমি আর তোমার মাধুরী
জেগে-জেগে কোনোদিন ফুরিয়ে যেতে না ঘুমঘোরে
আমি সে-নদীর তীরে যেন এক মৌন রাজপুরী।

এখন পাহারা দিয়ে দেখি আমি প্রতি ঘাসে-ঘাসে
বিগত মাঘের মতো ভ্রমর বিশ্বাসী আছে কিনা,

এখন পাহারা দিই দূর থেকে, ভিতরে যাই না,
এ-সংহত হ্রদে সেই পদ্মের শিশুর ছায়া ভাসে,
এ-বিস্মৃত নীলিমায় সেই চন্দনার শিশু ওড়ে,
সমস্ত পৃথিবী তুমি রেখে গেছ স্মৃতিচিহ্ন করে ॥

জড়িত গোলাপ জড়িত বকুল

অযুত কেন্দ্রমন্দ্রস্বর ঘরে-প্রাঙ্গনে বাজে,
সমস্ত সুর ছুঁয়ে-ছুঁয়ে দেখি, সমস্ত সুর শুনি,
সমগ্র সুর এল বুঝি কাছে, অযুতকেন্দ্র তবে
একটি কেন্দ্র, তার নাম আমি, আমার শরীরবুক
অলকানন্দা ভোগবতী সুরধুনী !

ঝম্পকতালে পাপিয়ার ঝাঁক একটি পাহাড় খোঁজে,
ছয়টি পাপিয়া দূরত্ব রাখে অমূর্ত চুম্বনে,
গোধূলি আকাশ প্রৌঢ় প্রেমিক, সচ্ছল রিক্ততা।

অপ্রকাশিত কবিতা আমার মুদ্রিত কবিতার
জড়ত্ব ভাঙে, অবচেতনায় অমোঘ তুষার গলে,
সম্পূর্ণতা শর্ত আমার, নুড়িপাথরের মতো
ভেসে চলে যাব, দ্বিধা করব না নিথর শূন্য হতে।

সম্পূর্ণতা শর্ত আমার ; যে কোনো কারণে হোক
বিশ্বাস করে বারবার যাব অনুপ্রাসের কাছে,
অনুপ্রাসের অরণ্যে আমি হারাব আমার পথ,
পথ খুঁজে পাব সবার মিলনে মিলিত ঐকতানে

তারপর শুধু স্বরসাম্যের শুদ্ধ হাওয়ায় খেলা,
তারপর শুধু হাওয়ার হৃদয়ে মোমের কান্তি জেলে
জাগ্রত নির্বাণ।

পঁচিশ বছর বয়সের আলো ঠিকরে পড়ুক জলে,
আমি কিছুতেই প্রতিবিম্বকে জলছবি বলব না,
আমার শরীর ভাসুক আমার ঘরণীর করতলে,
অলীক দুঃখ গভীর দুঃখ পুড়ে হয়ে যাক সোনা,
অভিজ্ঞতার বাইরে যাব না ভিতরে যাব না আমি,
চৌকাঠে আমি দাঁড়িয়ে কাঁপব ভবিষ্যতের দিকে,
স্পন্দন এক জীবিত শব্দ, স্পন্দিত আঙ্গিকে
স্থির হয়ে যেন উঠে যেতে পারি, স্থির হয়ে যেন নামি।
পঁচিশ বছর বয়সেব পাশে বাগানের কথা বলি,
আমি কোনোদিন কোথাও যাব না আমার বাগান ছেড়ে,
আমার বাগান আমায় ছাড়বে, এ-মাটি আকাশতলি,
জড়িত গোলাপ জড়িত বকুল মাটির আকাশে ফেরে,
জীবনের হাতে মৃত্যুর কাছে আমি পুষ্পাঞ্জলি,
ঈশ্বর, আমি তোমায় কখনো জলছবি বলব না।

স্বর্ণমুষ্টি

ডান হাতে এক মুঠি ছাই
তুলে নিয়ে বাঁ-হাতে রাখলাম, তারপর
ডান হাতে রাখলাম। আমি ডান হাতে
অনেক অনেকবার এঁকেছি স্বাক্ষর।
চোরের মতন কিংবা চৌর্যবাকা সাপের মতন
হঠাৎ পিছন ফিরে তাকালাম, শঙ্কাঋজু প্রাণে
দারুণ সাহস এল, অর্ধেক মানুষ অর্ধদেব
শিব ছাড়া এই রাত একটার শ্মশানে
কে থাকে? চোরের মতো চৌর্যবাঁকা সাপের মতন
আমিও শ্মশানলুব্ধ, মৃতদের সত্যের সন্ধানে।

শিরীষ ডালটা কাঁপল, একটা ডোমকাক
উড়ে গেল, ভঙের খোরাক
ছড়ানো রয়েছে, আমি মৃতদের জীবনের টানে
শ্মশানে এসেছি ; কিন্তু ডান হাতে এক মুঠো ছাই
তুলে নিয়ে মনে হল আয়ুর বাগানে
পারুল-মালতী-যূথী-রঙ্গনের উতল আঘ্রাণে
ভরে আছি, ভেঙে গেছে অবিশ্বাসী যমের বড়াই ।

আমার ডান হাত এক দীর্ঘ দীর্ঘ মালঞ্চের মতো
সুবিস্তৃত হল, আমি দেখতে পেলাম নতোন্নত
পিয়াল-মহুয়া, আমি শুনতে পেলাম :
"পৃথিবীতে অমিতার নাম
এখন কি মনে আছে মানুষের ? একজন অন্তত
আমায় কীভাবে ছাখে, মাঝে-মাঝে কৌতূহলে বুক
ভরে ওঠে ; কিন্তু থাক, উত্তর দিয়ো না । কৌতূহল
প্রেমের চেয়েও সত্য, ভয় হয় এখনো অমল
সম্পূর্ণ অমল হয়নি । কৌতূহল আমায় ভরুক ।"

আরেক আকণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনলাম কেঁপে-কেঁপে :
"কে তুমি ? তোমাকে আমি উর্মিমালা ভেবে
কাছে এসে দেখি তুমি উর্মিমালা নও, এমন-কি
উর্মিলার ভাই সুপ্রভাস নও, আমি একা
মানুষের জীবনের ময়ূরপঙ্খী
বেয়ে এসে দেখি, কই, এখানেও তার নেই দেখা ;
অথচ এখানে আছে উর্মিমালা ভেবে
বিরাট জীবন আমি কাটিয়েছি ভীষণ সংক্ষেপে !"

গোধূলিতে চিন্ময়ের এক প্রতারণা

একটি আকাশ থেকে আরো এক অগ্রণী আকাশে
যাবে বলে দশটি চন্দনা
পা বাড়াল। ঈশ্বরের দিকে যেতে চায়,
দেখে এক মেঘ ভাঙে, হাসে।

দশটি চন্দনা তবু ডানার লহর তুলে চলে
দেখে সেই ভাঙা মেঘ বলে :
"আর নয়, তোমাদের আর অনন্ত না—
অনন্ত ছিলেন এই এতক্ষণ তোমাদের পাশে,
ভেসে যান তোমাদের দিক পরিবর্তনের ফলে॥"

ঘর

ওধারে মানুষেরা কী যেন চায়, হঠাৎ আয়োজন ভাঙে,
অন্য ঢেউয়ে ওরা সাজায় পাড়ি, জাহাজডুবি মাঝগাঙে,
জীবনে পিপাসার পায় না জল, মরণে মেটে অশনায়া,
একটি ঘরে তবু গভীর বাসা : মেয়েটি ছেলেটির ছায়া।

জীবন ভরে বাঁচে অথচ জানে মৃত্যু আছে, আর জানে
নিখিল ভরে এক শান্তি আছে, যখন মৃত্যুর টানে
তলিয়ে যাবে পাবে নিথরনীল গহনঘনমেঘমায়া,
একটি ঘরে তবু গভীর বাসা : ছেলেটি মেয়েটির ছায়া॥

এক উদাসীন পান্থ

অন্ধকার থেকে অন্ধকারে
প্রাণের আনন্দ যাও, প্রাণের আনন্দ,
আমি একা, নাও গো আমারে।

নন্দন পাহাড়ে ঘন রাত,
আলিঙ্গনরত বৃক্ষ, আশ্লেষে অনন্ত,
অনন্তের একখানি হাত
পাহাড়ের গ্রীবা নত করে।

পাহাড়ী তমাল থেকে নন্দিত বেদনা ছোটে।
আর এই রাত্রি দ্বিপ্রহরে

রেলপথে আবছা কার মুখ
দেখে জেগে উঠল যাত্রী এক, তার বক্ষে লোটে
এঞ্জিনের দারুণ ধুকধুক।

ওর কোনো শঙ্কা নেই, ওর
স্বপ্নে যে এসেছে তার জয় হবে, নিরাকারা
এ-রাত্রি হবেই হবে ভোর।

প্রত্যাশিত সেই ভোর হলে
স্বপ্নের অলীক দরজা ভেঙে সত্যে দেবে সাড়া,
ওর মাথা তুলে নেবে কোলে

সে-ও তো ঈশ্বরী, তার দু'পা
অন্ধকারে দেখা যায় না, বাতাসের মন্ত্রণায়
সে এখনো আঁধারে অরূপা ;
রাত্রির তিমিরে প্রণয়ীকে
ভয় করে বলে তাই বারবার ভয় দেখায়—
এইভাবে এদিকে ঐদিকে

একদিকে সুখ অন্য ধারে
অপেক্ষাচিহ্নিত ক'রে প্রাণের আনন্দ,
আমায় দিয়েছ তুমি কারে ?

আমাকে আমার প্রেমিকারে
নিঃশব্দে চিনিয়ে দিয়ে এক উদাসীন পান্থ
উঠে গেল নন্দন পাহাড়ে ॥

প্রতিবেদন

কে জানে আমার চেয়ে আরো স্বচ্ছ করে ?
যদিও কুয়াশা মাঠ ভরে,
যদিও রাতের হাতে কুয়াশার শাঁখা,
শিথিল রক্তের টান পথের শিরায় আঁকাবাঁকা।

একটি বিপলে সব স্মৃতি ভেসে যায়,
আর এই বুখারিয়া নদী
স্মৃতিবিস্মৃতির পারে জলের পাথায়
নিথর দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যুর মতন মহাবোধি।

তবু সারা পৃথিবীতে কে জান আমার মতো ওরে,
এগারো বছর গেল, বুখারিয়া নদীর উত্তরে
এখনো রয়েছে সেই পুরনো পাড়া-গাঁ,
আমার মাটির ঘর, আর প্রায়-ভাঙা
দেয়ালে সিঁদুর ছাপ, মুছেও মোছেনি
কুয়াশার ঘোরে ॥

আত্মা

১

পুরনো বটের ছায়া ভালো, কিন্তু কতদূর ভালো?
বনানী এখানে ঘন আমার উপরে অবজ্ঞায়,
প্রবীণা নদীর জল ভালো, কিন্তু কতদূর ভালো?
ডাহুকপাখিটা ঝুঁকে জলের চিবুক ছুঁয়ে যায়।

শহরে তোমার থাকা ভালো ছিল। কয়েকটা সাপ
কেতকী ডিঙিয়ে কাঁপে শেফালিবীথির পাশ দিয়ে,
রৌদ্র চলে গেল, এক আজীবন অর্জিত গোলাপ
কার হাতে চলে গেল দুই হাতে পাপড়ি ছড়িয়ে—

আবার নতুন কুঁড়ি নিয়ে॥

২

পুরুষোত্তম দেবদারু ছাখো ঐ,
মাথার উপরে দুয়েকটি মেঘ ছাড়া
আর কিছু নেই, কেউ নেই। অদ্বয়ী
দেবদারু একা, শান্ত সর্বহারা।

নিয়তি হয়ত সদয় প্রেমের প্রতি,
নিয়তি
নিয়ে যায় সব মাধবীমালতীচারা,
রেখে যায় তবু কঙ্কালে সংহতি।

আকাশে
দুয়েকটি মেঘ আসে যায়, যায় আসে,
আসলে কোথাও একটিও মেঘ নেই,
কাশফুল জবা সাময়িক সঙ্কাশে।
হারিয়ে যাবার দরকার নেই ওরে,
কে এসে হঠাৎ মুছে নিল সব রং,
বিনশ্যৎসু অবিনশ্যন্তং,
স্রোতের পাথর সমুদ্রে যায় সরে॥

ডাকটিকিটে বিপিন পালের মুখ

আমি আমার ভালোবাসা পাঠিয়েছিলাম তোমার কাছে,
হে সম্রাজ্ঞী, যেমন অশথডাল
অশথডালকে ভালোবেসে অনায়াসে দাবি জানায়—
কিন্তু তোমার সাপেক্ষ দেশকাল।

তবে আমার ভালোবাসা দেশকালাতীত ধ্যানধারণা ?
করিনে সেই পল্লব বিস্তার ;
খুব বেশি দূর যাইনি আমি, আমার শুধু সীমান্ত এই
এদিক-ওদিক বাংলা ও বিহার—

ছুটি হলে দেওঘরে যাই, তখন আমার সঙ্গে থাকেন
পথের বন্ধু চারজন পাঁচজন,
এই দেওঘর আগে ছিল বাংলাদেশের, আজ বিহারের ;
(ছুরি চালান লর্ড কার্জন ?)

বাংলাদেশের মধ্য থেকেই তোমার চিঠি এসেছে আজ,
ডাকটিকিটে বিপিন পালের মুখ,
কিন্তু তুমি চোরা চাবুক মেরেছ ঐ চিঠির মধ্যে,
বিদেশিনীর আঙ্গিকে চাবুক।

চৌকাঠে তাই থমকে আছি, মায়েব দেয়া মোটা কাপড়
ঢেকেছে আজ আমার কঙ্কাল,
ঘরোয়া এই ঘরের ভিতর আমার পাশে স্পষ্টভাষী
ডাকটিকিটের বিপিনচন্দ্র পাল ॥

পান্থশালা : নীলকণ্ঠপুব

এখুনি লণ্ঠন জ্বলবে। নিভবে রোদ্দুর
দুই পাহাড়ের মধ্যে একটি আকাশ
বুকে নিয়ে আমি আর নীলকণ্ঠপুর।

এই মুহূর্তের আমি অন্ধ ক্রীতদাস,
নিরুপায় নিরালায় দেখে যাব আমি
দুই পাহাড়ের খাদে সূর্য মৃত্যুগামী ।

অথচ লণ্ঠন জ্বলবে ! মৃত্যু কত দামী ?
মৃত্যু, গ্যাখ প্রদোষের নীলকণ্ঠপুর
একটি জোনাকি, একটা ইউক্যালিপটাস ॥

তোমার প্রেমিক

সমস্ত ঘর ভিতর থেকে বন্ধ,
তবু তোমার ঘর-খোলা আনন্দ ।

ঘরের মধ্যে ভুল মানুষের ভিড়,
তবু তোমার নিজস্ব মন্দির ।

সাগরশায়ী তোমার গভীরতা,
তোমার প্রেমিক ঢেউয়ের চটুল কথা ।

তুমি পাহাড়, চূড়ার মগ্নবোধি,
তোমার প্রেমিক মূর্ত অসংহতি ।
পৃথিবীকে আকাশ পানে ধর,
আবার কখন মালার মতো পর ।

যার ভরসায় বুকের বিশ্ব গড়
তার বুকে এক পাতালষড়যন্ত্র ॥

আমার বাড়ির বয়স

কবে প্রথম কার কাছে এই মাটি
কিনেছিলাম, তার আগে এই মাটি
কার ছিল, আর কাদের-কাদের ছিল ?
ভগবানের স্বত্বাধিকার প্রথম কবে গেল ?
কোটি বছর আমার বাড়ির বয়স ।

প্রথম সব দেবদারুর শিকড় ছিন্ন করে
দ্বিতীয় দেবদারুর মসৃণতা,
কেয়ারি আর বাহারি ফুল, পাথর-বোনা পাঁচিল,
বাড়ির কোলে হ্রদের সহজ অনার্দ্র আর্দ্রতা,
আমার বাড়ির বয়স কতটুকু ?

অনেক বন্ধু ছিল আমার, বাড়ি আসবার আগে
অনেক বন্ধু ছিল, আমার বাড়ি আসার পরে
পথের তরল ব্যবধানের কঠিন উপত্যকায়
সবাই গেল, অরুণাংশু ছাড়া ;
অরুণাংশু কালকে গেল, গেল যে ফিরল না,
একরাতে আজ কোটি বছর আমার বাড়ির বয়স ॥

ঘুম

আবার কখন ঝড়ের শেষে নিজের শরীর ফিরে পাওয়া—
সমস্তপ্রাণ বকুলবেদী বকুল-ছাওয়া,
ডিঙি নৌকোর শান্তি শান্তি দাঁড়ের শব্দ, শান্তি শান্তি,
নারিকেলের পাতায় পাতায় দীঘল হাওয়া।

তোমায় নিয়ে গিয়েছিল তিনটি পুরুষ একটি নারী
বলেছিলে : 'সবার বন্ধু হতে পারি' ;
তিনটি পুরুষ নারীটিকে নিয়ে গেল খালের দিকে,
তোমায় তখন করেনি কাণ্ডারী।

আর শেষে ঐ নারীটিকে বিকেলবেলায় তোমার কাছে
রেখে গেল তিনটি দস্যু, তোমার বুকে জায়গা আছে
মনে করে বনের ভিতর তারা
দুঃখের রোমাঞ্চ খুঁজে চলে গেল মাতাল আত্মহারা।

তুলসী তলায় অঙ্গনা সেই বিবর্তিতা প্রাঙ্গনা সেই নারী
এল তোমার বুকের ভিতর, জায়গা নিতে, জানুর উপর
কবরী তার দিল সে সঞ্চারি,
দেহ তো নয় মোমের ক্ষরণ, রেখেছে তার একটি চরণ
অন্ধকারে, আলোর শরীর পরিপূরক তারি।

ওপারে নীল হলুদ হল, হলুদ শেষে অবিমিশ্র কালো,
প্রসারিত ভালোবাসা শেষ দুইবার করুণা ঠিক্রাল ;
নিরালা বন, বনের প্রান্ত বলে উঠল : 'হে অশান্ত,
কাকে তুমি ভালোবাসার আলো
দিতে চাইছ ? তুমি যাকে ভালো করে কখনো জাননি
তাকে তুমি আলিঙ্গনে বাঁধলে কেন ? তোমার আলিঙ্গনই
পাবে যে সে জানত না, আর সেই তিনটির একজনা তার
লক্ষ্য ছিল ভেবেছিল সহজ হবে নীরব নির্বাচনী ;
কিন্তু সেজন তৃষ্ণাজীবী, অন্য দুজন তার আদর্শে গড়া
জীবন-অন্ত-করা ;
তোমার কাছে রেখে গেছে তারা যে-ফুল ঝরিয়েছে
তোমার সমবেদনা তার বিশল্যকরণী।'

হঠাৎ শব্দ থেমে গেল, একটু জ্যোৎস্না পাতার জানালার
মধ্য দিয়ে এসে পড়ল, তুমি দেখলে নগ্ন শরীর তার
শিশুর মতো পড়ে আছে, গভীর ঘুমের কারুকাজে
চোখের দুটি নম্র নদী, ভ্রূযুগে ভৃঙ্গার।

শিশুর চেয়ে আরো সহজ কী যেন কোন কাজল পরেছে সে
সারা শরীর যেন শুধু একটি নয়ন, তোমার চোখে এসে
একটু ঘুমের ঘর বেঁধেছে মাকে ছেড়ে সকল ত্যেজে
তোমার কাছে ঘুমোতে আজ এসেছে সে মানুষ ভালোবেসে॥

বধূটি স্বগত

কখন আসবে ঠিক বলতে পারি না,
সাঁঝের আগেই ফিরবে কিনা
তা-ও তো জানি না। যেই মিলাবে রোদ্দুর,
ঘোমটার আড়াল হবে ইব্রাহিমপুর,
ঘোমটা খুলে দেবে তার হাত
এইটুকু জানি।
এখন নিজেকে ভাবে বড় সাবধানী,
আগের চেয়েও তাই আস্তে আসে পথ দেখে-দেখে,
আখ মাড়াইয়ের কল থেকে
ইব্রাহিমপুর অব্দি বড় জোর দুই-তিন ক্রোশ—
আসার পথে সে কেন আমার কলস
পুরুষ হয়েও ভ'রে আনে? জানি, জল ভরতে জানে,
কিন্তু পথে সব জল পড়ে যায় যেখানে-সেখানে।

হাওড়া স্টেশনে

বউটি লজ্জায় চম্‌কে দীঘল ঘোমটা
হ'য়ে গেল, কিন্তু কী করবে?
দেশের পুরুষ ওর চুলের উৎসবে
ঝুঁকে পড়ে গেছে, আর ঐ ভিড়ে ঘরের ঘোমটা
জ্বালিয়ে নিয়েছে, তার দুই হাত দুই চোখ দিয়ে
চারকোণা দেয়াল বানিয়ে
টাঙিয়ে নিয়েছে এক আকাশের মতন মশারি:
দূরের পুরুষ আমি পুড়ে মরি, আর সেই নারী॥

এক-জানালা-রাত্রি আমার

এক-জানালা-রাত্রি আমার কাটল কেমন করে ;
মোগলসরাই প্যাসেঞ্জারে বৃষ্টি নামল তোড়ে।
বৃষ্টি নামল, ভীরু ধানখেত ভালোবাসার মতো,
আলের পথে আলের পথ আলিঙ্গনরত।

এক-জানালা-রাত্রি আমার কাটল কেমন করে,
বৃষ্টি থামল, সাঁকোর তলায় এই পৃথিবী ক্রোড়ে
মা জননী বসে আছেন, চোখের সামনে খালি
শহরে কাজ নিতে পালায় বলাই বনমালী।

বলাই বনমালী সুবল শ্রীদাম সুদাম শেষে
রমেন নরেন পরেশ হল শহর ভালোবেসে।
মধ্যমগ্রাম হালিশহর রামপ্রসাদী সোনা
চুরির ভয়ে আব্জে নিল চব্বিশ পরগণা।
'মা গো, ভীষণ ঘুম পেয়েছে, আমায় রক্ষা করো,'
বলতে বলতে সামলে নিলাম, আকাশ জড়োসড়ো,
আকাশ আমার বুকের নিচে মাথা গুঁজবার আশায়
জড়ো হল। কে আর তবু একভিড় লোক হাসায় ?
দু-হাত থেকে ছিটকে গেল কাঁপা হাতের কুপি,
চোখ-ধাঁধানো আলো ছুঁড়ল কে এক বহুরূপী,
এক আলালের ঘরের দুলাল গাড়ির মধ্যে জেগে
বাংলাদেশের পাতা ছিঁড়ল ভূগোলের বই থেকে॥

যাত্রী

(অরুণ তালুকদারের স্মরণে)
ভিতরদেহলি থেকে পথ গেছে দিগন্তের পানে,
আমি তার প্রান্তরেখা ছুঁয়ে আজও ফিরে ফিরে আসি ,
তবু তো আমার আগে তারা এই পথের বিতানে
দলে দলে চলে গেল, নিয়ে গেল পারিজাতরাশি,

প্রথম প্রেমের মতো অনাহত প্রেমের বিশ্বাসে।
আরেক মন্দির ছিল এদিকেও, ভেঙে গেছে বলে
পান্থেরা যখন আসে, রাত্রি যাপে ; রাত্রি শেষ হলে
কী জানি কোথায় যায়, অতন্দ্রায় জ্বালা কারো চোখ,
আবার কারো-বা চক্ষু ঘুমের আধারে ব্যথা ভোলে,
কোনো চোখে জল নেই ; যদি এই নিথর নির্মোক
ধুলোয় খসাতে চাই, যদি আমি বলি 'ভোর হোক,'
শঙ্খের মতন সেই শুভ্র ক্ষোভ উর্ধ্বে তুলে আনি,
ধূলিতলে ঝরে তবু আমারই সে কান্নার কনক।

কান্না ভুলে গেছি তাই, আর তাই ভুলে গেছি বাণী।

অথচ এখনো তবে কেন আমি এদিকেই আছি,
দুয়ারে দুয়ারে ফিরি বাণীহারা, ভোরের ভুবনে
কথার কাকলি ছিল, নিয়ে গেল কৃপণ দুর্জনে,
প্রতিবেশীদের সঙ্গে মূকাভিনয়ের কানামাছি
খেলে আমি সুখ পাই ; কথা নেই, সুখে তাই বাঁচি।
আজকে শব্দহীন রাত্রে ঘরে এসে সব আলো নিভিয়ে
আয়নায় দুচোখ মেলি, মুছে ফেলি আমার প্রমাণ,
আপনার স্মৃতি হই, আমার শরীর ভেঙে গিয়ে
রাতের আঁধারে বয়, নেই তার ছায়ারও সন্ধান।
বন্ধু, তবে আমি এই বিস্তারিত রাতের আঁধারে
তোমার আকাশে আছি, তোমার নিশ্বাস এসে লাগে
আমার ললাট জুড়ে, উত্তাল হাওয়ার পূর্বরাগে
ভেসে যাই, ভেসে চলি, মধ্য দরিয়ায় ঢেউ বাড়ে,
সিন্ধু পাখিরাও ডোবে। কারে তবে খুঁজে পেলে ? কাকে
পটভূমি করে তুমি এই শূন্য হিম অন্ধকারে
হে পূর্ণ পুরুষ জাগ, কে তোমার অন্তরালে জাগে ?

চুপিচুপি ফিরে আসি, আমি সেই অপূর্ব তিমিরে
প্রতিহত আজো, তাই নিজের নিশীথে এসে ধীরে
ঘরের প্রদীপ জ্বালি, দেওয়ালের নয়নে কজ্জল ;

ভাই পাশ ফিরে শোয়, যদি এ-শয্যার দুই তীরে
আমার অনিদ্রা থেকে ঝরে কোনো নিদ্রার সুফল
আমার ভাইয়ের চোখে—আমি এক অন্ধ অভিমানে
সে-আশায় রাত্রি জাগি, সে-আশায় রাত্রি হেঁটে চলি
আমিও তোমার পাশে একদিন দিগন্তের পানে
ফিরে যাব, তার আগে খুলে রাখি ভিতরদেহলি ।।

স্বকীয়া

কী করে মুখ তুলতে অমন চোখের পাপড়ি বোজা,
কী করে মুখ নিচু করে
সীতার মতো এই দুয়োরে
আগল দিয়ে খুঁজতে আরেক নিমগ্ন দরোজা ?

কীভাবে নীল কবুতরের হলুদ মানুষের
নানান শব্দ বুঝতে পারতে,
ফুলকে ভগবানের স্বার্থে
নিয়োগ করতে, বুঝতে পারতে অসীম শিশুদের ?

হয়ত অচিন্ পান্থেরা ঠিক এপথে বাঁক নিয়ে
এম্‌নি হত দিনান্ত পার,
'বিরুজিয়া' নাম্নী পাহাড়
বসে থাকত নির্বাপিত কাহিনী আগলিয়ে ;
হয়ত-বা ঈশ্বরের নামে অর্চনানির্ঝরে
এই গাঁয়ে সমস্ত ভিটা
আর সমস্ত পৃথিবীটা
কাঁপত গৌরী রোদ্দুরে বা মহাদেবের ঝড়ে ;

কিন্তু তুমি কেমন করে কখন কোথায় কবে
একটি অন্ধ ভিখিরিকে
দুই নয়নে অনিমিখে
বহন করতে সারাজীবন মৃত্যুর গৌরবে !

মৌল কণ্ঠ

মৌল কণ্ঠ কেঁদে উঠল পথের অন্ধকারে ;
দরজা খুলে কেঁদে উঠলাম : 'মাগো,
তুমি আমায় ঘরের বাইরে থেকে
ডেকে উঠলে ? তুমি আমায় ঘরের বাইরে নিয়ে যাবে
তুলসীতলায় ?'
—ঘুমন্ত মার মুখে দেখলাম শান্ত স্বপ্ন-প্রদীপ।

মৌল কণ্ঠ কেঁদে উঠল পথের অন্ধকারে ;
দরজা ভেঙে কেঁদে উঠলাম : 'অরুণিমা, অরুণিমা,
তুমি আমায় শয্যা ছেড়ে ঘরের বাইরে থেকে
ডেকে উঠলে ? তুমি আমায় ঘরের বাইরে নিয়ে যাবে
প্রথম কুঁড়ির স্বর্গীয় সেই প্রতিশ্রুতির স্মৃতির বাগানে ?'
—অরুণিমার মুখে দেখলাম শান্ত স্বপ্ন-প্রদীপ।
মৌল কণ্ঠ কেঁদে উঠল ঘরের অন্ধকারে ॥

কালান্তর

বৃষ্টিতে কখনো তুমি একলা যাবে না বলেছিলে।
কাঁচের জানালা ধরে অতসী হলুদ মুখে হাসে,
অপরাজিতারা খুব ক্লিষ্ট হয়ে গেছে উপবাসে ;
একটি অপরাজিতা তবু তার নীলে
প্রাণপণে জেগে আছে সাধনার বানানো আকাশে।

'ওভাবে কেউ কি যেতে পারে ?' সেই মর্মে প্রতিশ্রুতি
সযত্নে পরিবেশন করেছিলে। সময়ের যূথী
ঝরে গিয়ে সৌগন্ধ্য মেরুদণ্ডে ওঠা-নামা করে
শিরশিরে পারার মতো, আর অন্তঃশরীরের জ্বরে
অতীন্দ্রিয় পারা ঝরে রক্তের উদ্যানে, সরোবরে ॥

আমার ছায়া

যেন আমার ছায়া পড়ে
মাঠের সবুজের বুকে,
জীবিত এই দেহ বহন করে
তৃণেরা হাঁটে প্রান্তরে।

আমার যেন ছায়া পড়ে
নীলের আয়নায়, যেমন
পাপিয়াদের সাথে শাদা মেঘের
গভীর সঙ্কর্ষণ ;
স্মৃতির পাশাপাশি আনন্দের
যুগলশয়নের ঘরে ;
হঠাৎ ফিরে-আসা প্রেমিকটির
রক্তে শ্বেতচন্দন।

জীবন যেন এক প্রগল্‌ভতা
মৃত্যু শান্তির জল,
জীবন মরণের ঘরণী লতা
মুক্তি দু'জনার ফল,
জীবন শুধু এক গানের কথা
মৃত্যু সে-গানের সুর,
জীবন অনসূয়া প্রিয়ংবদা
শকুন্তলা মৃত্যুর।

জীবন মরণের দুই পাহাড়
যন্ত্রণার
জীবন মরণের দুই সাগর
দ্বীপান্তর
জীবন মরণের দুই বাগান,
পারুল টগরের আত্মদান,

দেবদারুর প্রাণে মাটির টান,
সবার সব পাপ অপ্রমাণ।

যেন আমার ছায়া পড়ে
পাহাড় সাগরের দ্বৈতগীতে,
বাগানে আর প্রান্তরে ;
আমার ছায়া যেন আলোর দিকে
প্রিয়ার মুখ তুলে ধরে,
লুকিয়ে যায় শেষে তাদের কাছে
এসেছে যারা তার পরে ।।

মেঘের মাথুর

দুটি মেঘ ছিল দম্পতিচুম্বনে,
আর এই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল
জন্ম নিলেন ঈশ্বর নশ্বর।

একবার তাঁকে রাধার সঙ্গে দেখলাম
বাঁশরী ওষ্ঠে, কম্প্র অসমভঙ্গে,
তারপর তাঁকে পাহাড় ভাঙতে দেখলাম
কেউ নেই তাঁর অঙ্কে।

সব মানুষের পাপের পাহাড় কাঁধের উপরে তোলা,
নীল আকাশের স্তব্ধ যমুনা সপ্ততন্ত্রী খোলা
আর্ত আর্দ্র স্বর।

এক মেঘ থেকে আরেক মেঘের সাঁকো
গাঁথতে গেলেন, কিন্তু নিথর শূন্যে
মিলিয়ে গেলেন নশ্বর ঈশ্বর ।।

ওরে ও চপল

ওরে ও চপল, তুমি ভয় পেয়ে চম্‌কে উঠলে
দুপুরের ঘুম ভেঙে যেই
একা জেগে উঠে দেখলে : পান্থশালা নীলকণ্ঠপুর।

কাছে-দূরে দেওঘরের পাশে আর দুম্‌কার কিনার ছুঁয়ে-ছুঁয়ে
অন্যমনে পাহাড়ের সারি
অনন্তের ধ্যানে গেছে বহুদূরে চলে।
কিন্তু মনে হল ওরা পিরামিড
মৃত্যুর খেয়ানে নীল। দেবদারু মহুয়া পিয়াল
যারা পাশাপাশি চলে তারা সব মৃত্যুগ্রীব উট।
দারোয়া বলে যে-নদী যশিডির জলভরা চোখ,
তাকে তুমি একবার মরূদ্যান ভেবে নিতে যদি,
ভালো হত। তবু আজ তিরিশে আশ্বিনে
ওরে ও চপল, তুমি দেখলেনা শুনলেনা কিছুই।

আর ঐ ক্লান্ত এক কাঠুরিয়া পিঠের সাঁকোয়
বোঝা টেনে চলে গেল, কালভার্ট থেকে
পথের ঝর্ণায় নেমে আঁজলা ভরে নিল, তারপর
শিবমন্দিরের বাঁকে ওর মুখ ঢাকা পড়ে গেল।
কাঠুরের ছদ্মবেশে ও হয়ত ঈশ্বর এসেছিল :
যখন নিজের কাছে হেরে গিয়ে তুমি
ভয় পেয়ে চম্‌কে উঠলে, অস্তিত্বের ভারে
নুয়ে পড়ে ধরণীকে পান্থশালা বলে ভেবে নিলে—

কাঠুরের ছদ্মবেশে হয়ত ঈশ্বর চলে গেল॥

গ্রন্থি

পিছনে-পিছনে কারা আসে ;
শুধু বট নয়, শুধু তমালেরা নয়,
হয়ত মৃত্যুতে ঝরা সমস্ত মানুষ
পিছনে পিছনে ফোটে বাতাসের শাশ্বত কার্পাসে।

কেউ তাল ভুল করে ডমরু বাজায়,
কেউ তোলে সুরের লহর,
মুখের আভাসগুলি মুখ বলে বুঝে নেওয়া যায়
জীবনের ক্ষণিকতা ভালো করে বুঝবার পর।

হঠাৎ গ্রামের পথ একমাত্র পথ হয়ে গেল,
এই পৃথিবীতে কোনোদিন
শহর ছিল না আর তুমি কোনো শহরে ছিলে না,
আমি মুক্ত কালকেতু আজন্ম গ্রামীণ।

মাধবাচার্যের মুখ সরে গেলে শ্রীকবিকঙ্কণ,
কবিকঙ্কণেরও মুখ সরে গেল . প্রাণের পসরা
যতদিন থাকে দৃঢ় দু'বাহুতে শিশুর মতন
তুলে ধরি তোমাকে, ফুল্লরা॥

সূত্রধার

রুগ্ন শীর্ণ,
কে যাও আমার পাশ বেয়ে ? তুমি জীবনদেবত
নও, তুমি নও আমার জীবন অথবা প্রাণের
গভীর বিধাতা, তোমার শরীর আমার শরীরে
বুঝতে পারি না ; আর, তুমি নও মৃত্যুর ছলে
ডাকঘরে সেই আয়ুষ্কান্ত রাজার মতন।

রুগ্ন শীর্ণ,
কে এসে আমার ক্ষণভঙ্গুর দুর্গের মান

প্রাণপণে রাখ, বয়সনোয়ানো শপথের ফুল
বিকোতে দাও না মৃত্যুর কাছে, জীবনের কাছে।

রুগ্ন শীর্ণ,
কে ওঠ আমার ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে,
আমার দেহের লণ্ঠন হাতে সারা ঘর ঘোরো,
ভুলে যাও হাওয়া তোমার কেউ না আমার কেউ না!

আবার জীবন

এক হাজার বছর পর জানলা খুলে দেখলাম আমার টগর গাছ স্থির দাঁড়িয়ে আছে,
আমার কবর খোঁড়া হয়নি এখনো, কোনো কবর ছিল যে বলে মনে তো হল না;
ফুটফুটে ছোট্ট ছেলেটা এক অমিত উদ্যান খুঁজে পথ ভেঙে আল ভেঙে পথ হেঁটে যাচ্ছে,
তার কী যে রোদ কী যে রোদ্দুর কী যে রৌদ্র, মাঠের উপর মগ্ন ঘাসের ঘটনা।
সকাল হবার আগে সকাল হয়েছে বলে অন্ধ স্বামীটির চোখে ঠোঁট রেখে-রেখে
হাত ধরে-ধরে তাকে চৌকাঠের বাইরে এনে একটুক্ষণের জন্য আল্‌গা দিয়ে শেষে
ঘরে নিয়ে গেল। ওকে দৃশদ্বতী নদী বলে ডেকে উঠলাম দূর থেকে।
ভগবান, আমাকেও আবার কবিতা লিখতে বসতে হল তোমার আদেশে ।।

তোমার আমার দুঃখ বালির পাহাড়

কে তুমি, প্রবাসী? তুমি সান্ত্বনার খোঁজে
এসেছ, আমারি মতো, সেই কথা জানি।
এতটা অথৈ পথ এলে পদব্রজে?
কাল ছিলে রাজা, আজ প্রজা, মানহানি!

জানি না তোমার নাম, এসেছ কেন যে,
সেইটুকু জানি, শোন, সেটুকু সম্বল
খাটিয়ে সুদে-আসলে ভীষণ সহজে
পার হতে পারো ওই নভোমণ্ডল।

পেরিয়ে যেয়ো না। তুমি সপ্তসাগরও
পার হতে পারো, তবু পার হয়ে যেয়ো না ;
যে আজ উত্তীর্ণা, তুমি তারে ক্ষমা করো,
ক্ষমা করো, অনুত্তীর্ণ, তোমার বেদনা।

খুব কম কথা বল, বীণাপাণি নদী
পাথর বাজায় শুনে ঘরে ফিরে যাও,
তারায় তারায় কার অরব আরতি
মরণ ফেরায় দেখে ঘরে ফিরে যাও।

শেফালির মুখে দৃঢ় মৃদুতার হাসি,
ঐ নিশিপদ্ম তোলে পৃথিবীর ভার,
ওখানে পরেশনাথ, তার পাশাপাশি
তোমার আমার দুঃখ বালির পাহাড়॥

দৌহিত্রী

প্রদীপ জ্বালবে বলে অন্ধকারে বসে আছ। ওকি
মৃত্যুর চেয়েও স্থির পরিকল্পনার একাগ্রতা
তোমার চিবুকে। তুমি স্নিগ্ধ মাতামহের বয়স
বিত্ত করে পিতামহ প্রজাপতি ব্রহ্মার ক্ষমতা
পরীক্ষা করছ, তুমি স্বচ্ছ ঢেউ রয়েছ থমকি,
শিবলিঙ্গ শিলাতলে, অন্ধকারের শান্ত রস।

প্রেমিকের দল কাঁপে বারান্দায়, একটি প্রেমিক
নির্বাচন করে নিতে হবে, আর সে-প্রেমিক পিতা
হতে পারে, কালের জঠরতলে তোমারও দুহিতা
প্রচ্ছন্ন রয়েছে। আমি সব জানি, সবগুলি দিক
জানি আমি ; তাই বলি, একদিকে এক অন্ধকারে
অপেক্ষাঘনিমচক্ষু জ্বেলে রাখ, যেয়ো না সংসারে॥

রাত্রির মন্দির

কার ভয় কর ? স্থির খদ্যোতের সবুজ তর্জনী
রাত্রির মন্দিরে জ্বলছে। অন্ধকার নিভছে। একদিন
যারা ছিল, যারা নেই তারা এই মন্দিরে সবাই :
কেউ দেবদারু কেউ তমাল কারো-বা রুগ্নদেহ
নশ্বরতাশেষে দিব্য চন্দনের সুস্থতরু হয়ে
দাঁড়িয়ে রয়েছে। সব সেরে গেছে, সকলের ব্যাধি
আরোগ্য হয়েছে, এই রাত্রির মন্দিরে তুমি ছাড়া
কেউ তো অসুস্থ নেই ওরে অন্ধ মরণ বিলাসী,
ঈশ্বর তোমার বুকে তুমি বুঝি তাকিয়ে দেখবে না ?

জলস্থল

১

স্মৃতির চন্দনা ডাকে, আমি তীরে বসে, কিন্তু নদী
কখন গিয়েছে ঘুরে, শিয়ালের মতো ছায়া মেলে
অধর বিছাই জলে, কিন্তু শাদা মেঘের তপতী
ভালো করে বুঝেছে যে তুমি যে হঠাৎ সরে গেলে
জলের আভাস থেকে মাটির আড়ালে, সব গতি—
যেখানে নীরব, সব অগভীর চপল দরদী
প্রেমিক যেখানে ব্যর্থ সমবায়ী স্বর্ণদীপ জ্বেলে।

২

স্মৃতির চন্দনা ডাকে, দুই হাতে জলের মেখলা
আঁকড়ে ধরে কেঁদে উঠি ; এ আয়ুর অরণ্যে রোদন ;
এবার সমাপ্ত হল আমার সমস্ত আয়োজন,
আর তুমি আমার নও, মগ্ন অরূপের কারুকলা
এবার নূতন রেখা এঁকে দেবে তোমার চিবুকে,

ঈশ্বর তাহলে বুঝি এইবার তোমার শিশুকে
অস্বীকার করে ফের অনার্তবা হিরণ্যাভরণ
দেবেন তোমার অঙ্গে ; চেয়েছিলে অপরিবর্তন,
অটুট প্রেমের অভ্রে উদ্ভাসিত তোমার আনন—
আর নয় ম্রিয়মাণ নশ্বরের সঙ্গে পথ চলা,
স্রোতের ঘূর্ণীতে নয়, সুবিনীত আত্মার ঝিনুকে।

৩

স্মৃতির চন্দনা ডাকে, অক্ষয়বটের বুক থেকে
কোন ফাঁকে সরে গেছে উত্তেজিত শ্যামকণ্ঠ পাখি ;
চিন্ময় মেঘের দাবি সঞ্চারিত অসহিষ্ণু মেঘে,
কঠিন মাটির হাড়ে অতীন্দ্রিয় উপরচালাকি
দিয়ে জিতে গেল জল। জল তার শীতল পাথায়
বয়ে নিয়ে গেল সব ; স্বপ্ন আর স্বপ্নের উদ্বেগে
জাগরী যন্ত্রণা যত, খড়ের বালিশে মুখ রেখে
তৃপ্তির বিবাদ যত, জলের পাথায় লুপ্তপ্রায়,
প্রতিজ্ঞার ফাঁকে ফাঁকে অপরূপ পাপের জোনাকি
অন্ধকারে ডুবে যায় ; কারা এসেছিল ? কারা যায় ?
দেখেছ, প্রপিতামহ ঈশ্বর কি ভীষণ একাকী !

স্বপ্নপ্রয়াণ

স্বপ্নে কাল তোমায় ডাকলাম :
'এ-জন্মের শহর ছেড়ে যাব,
এ-জন্মের শহর ছেড়ে পাব
তোমায়—তুমি গ্রামের মেয়ে—আর
হারানো সেই গ্রামকে পাব, যার
দু'অক্ষর নাম।'

আমার কথা শুনল গ্রহতারা,
আমার কথা শুনল তুমি ছাড়া
সবাই, তাই সম্মিলিত তারা
তন্দ্রাতুরা তোমার চোখে চেয়ে
আমার নামে অন্ধকার ছেয়ে
নিভিয়ে দিয়ে আমার কথাকলি
সরিয়ে নিয়ে তোমার নামাবলী
করল জড়ো নিবিড় ঘনঘাম,
মেঘ বাজাল অমোঘ মল্লার,
হারাল সেই হারানো গ্রাম, যার
দু'অক্ষর নাম।

শান্তি আমার

শান্তি আমার চিবুক বেয়ে শান্তি,
আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম।
পথের প্রান্তে প্রদীপ জ্বলে উঠল
অথৈ আলো আয়ুর দেয়াল ভাঙছে।

সমাধানের প্রশ্ন কে আর তুলছে?
শুধুমাত্র বিপর্যস্ত মানুষ
নিয়ন্ত্রিত অধিকারের বাইরে—
দ্বন্দ্ব দুঃখ মৃত্যু ষড়যন্ত্র।

তবু আমার চুলের কালোয় শান্তি,
যদি বল বোবা বধির অন্ধ,
যদি বল নশ্বরতা সত্য
তবু আমার রক্তে-রক্তে শান্তি।

অতিরিক্ত অন্ধকারের গ্রন্থি
খুলব বলে গিয়েছিলাম, আমি
নিরসনের আশায় গিয়েছিলাম ;
অন্ধকারের সমস্ত অশান্তি

আমার প্রিয়ার নাকের বেশর ছুঁয়ে
অন্ধকারের সমস্ত অশান্তি
তন্দ্রাহারা প্রিয়ার চোখের পাতায়,
শান্তি আমার চোখের বৃন্তে শান্তি ॥

মঞ্চ থেকে

মঞ্চ থেকে মৃতদেহ সরিয়ে দাও
সরাও সরাও বীভৎস ঐ সামঞ্জস্য,
জানতে চাই না ক'জন কৃষক মরে গেছে
আমরা চাই অসামান্য স্বর্ণশস্য।

যে-মাঠে নেই ফসল, কিন্তু সবুজ গাছে
প্রাক্তনী সব কুহকিনী অটুট আছে
তাদেরও চাই, তাদের সঙ্গে যুদ্ধরত
যেসব পুরুষ তাদেরো চাই, এবং যত
মরুভূমির বালির ভিতর চিরকিশোর
ভ্রূণরুদ্ধ, আমরা যাব সবার ভিতর।

আমরা যাব ধারাবাহিক পায়ে-পায়ে
পিতৃকল্প পাহাড়ে, ফের পাশের গাঁয়ে
মন্দিরে ক্ষীণ পুরোহিতের শরীর খুঁড়ে
লুপ্ত প্রেমিক খুঁজে আনব, পূজারিনী
বসবে আবার পুরোহিতের হৃদয় জুড়ে ;
গাঁয়ের যত শাদা ডাইনী হলুদ ডাইনী
শান্ত হবে, ক্ষমাশুক্লা বিধবাদের

শুভ্র হৃদয় পরবে তারা, প্রথম চাঁদের
অকলঙ্ক প্রভাব নিয়ে এ-অন্ধকার
মুছবে তারা, পাহাড় চূড়ায় ঘুরে-ঘুরে
বলবে তারা 'কী অন্ধকার? কে অন্ধকার?
গাঁয়ে গাঁয়ে দেশে দেশে সাগরে আর
হ্রদের স্বচ্ছ সফলতার অন্তর্লীন
অন্তবিহীন যে-অন্ধকার, যে-অন্ধকার'
তরুণ প্রেমিক বহন করে সমস্ত দিন ;
মধ্যদিনের, মধ্যরাতের সিংহদ্বার
খুলতে হবে, তা নাহলে আমার শরীর
তোমার শরীর সবার শরীর মাটির নিচে
মাটি হবে, প্রতিষ্ঠিত নীলাদ্রি যে
মেরুদণ্ড ভুলে গিয়ে আবার মাটির
নিচে গিয়ে সাপের মতো পিছল হবে,
সহজ সাপের কুটিলতায় হঠাৎ তবে
বাসুকি তার কঠিন ভিত্তি ভুলবে নিজে,
শক্ত করে ধরতে হবে ভীরু পাহাড়।

রাত্রি দু'টো বাজবে যখন, প্রথম অঙ্কে
নীলা, তুমি আমায় নিয়ে তোমার সঙ্গে
তোমার বাসর ঘরে যাবে, তুমি যখন
ঘুমে বিবশ হয়ে পড়বে, তোমার কাঁকন
প্রতীক নিয়ে চলে যাবার আগে তোমায়
দিয়ে যাব সুবিশ্বাসী দেবতাদের
দেবালয়ে। রাত তিনটের ঘণ্টা বাজলে
দ্বিতীয়াঙ্কে, অরুণাক্ষ, তোমায় আগলে
নিয়ে যাব, তুমি আমার রুগ্ন বন্ধু,
এই জীবনে অনেক মৃত্যু অনেক জন্তু —
সবার থেকে তোমার দেহ রক্ষা করব
এবং তোমায় আরো একটি মন্দিরে ফের

রেখে যাব। দ্বিতীয়াঙ্কের শেষের দৃশ্যে
আমি ভীষণ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ব।
তৃতীয়াঙ্ক সে যেন এক একাঙ্কিক :
পাথরতলে আমার কোলে আমার নিঃস্ব
নগ্ন শরীর, আলোর ছায়ায় আমার শিখা ;
শেষের অঙ্কে আমার শিখায় ছায়া আমার
দগ্ধ হবে, আমার শরীর থাকবে না আর।
কিন্তু তখন জেগে উঠবে সব নায়িকা,
পার্শ্বগামী চরিত্রদের পুরুষ করে
তুলবে তারা, এই সমস্ত বালির পাহাড়
পিতৃকল্প পাহাড় হবে, পাহাড় ধরে
আমরা যাব জলের মতো পায়ে পায়ে
পাশের গাঁয়ে, পাশের গাঁয়ে, পাশের গাঁয়ে

দৃশ্য-কাব্য

রোদ্দুরে যাই, রোদ্দুরে যাই মিলিয়ে
শরীর বিলিয়ে, বিধাতার চেয়ে শক্তিতে কিছু কম,
মানবিকতায় কিছু বেশি, তাই কিছু-কিছু বিভ্রম ;
আয়ুর শরতে রঘুবংশের দিলীপ আমার রাজা,
সূর্যের কাছে শুধু আমৃত্যু দেহত্যাগেই বাঁচা ;
মাঝে-মাঝে তবু সিঁড়ি ভেঙে নামি রুগ্ন হৃদয় নিয়ে,
রুগ্ন রূপকে ছায়া-নট সাজি . মালবিকাগ্নিমিত্রম্।

আত্মহত্যা করতে গিয়েও বারবার ফিরে আসা
নিজের বাড়িতে, নিজের বাড়ির ছাতে
চামেলি-মেঘেরা চৌকাঠ গড়ে মৃদুল সবল হাতে,
পুরুষ কবিকে সংহত দেখে ভয় পেয়ে যায় যম,
দেয়ালে নিজের বিশেষ রক্ত : আ মরি বাংলা ভাষা।

রবীন্দ্রনাথ মৌলি পাহাড়, জলপ্রপাত আমি ;
দুঃখ তো আর বলি না ইনিয়ে-বিনিয়ে,
কবিতায় বাঁচে প্রজ্ঞাশাসিত অসুস্থ পাগলামি,
রোদ্দুরে যাই, রোদ্দুরে যাই মিলিয়ে ॥

শাদা মেঘ দাবি করে

শাদা মেঘ দাবি করে . একমাত্র আমাকেই দ্যাখো,
খুব ভালো করে বোঝো আমি ছাড়া কেউ নেই তোমার,
বিমল রক্তের নিচে প্রতিশ্রুতি রাখ যে কখনও
একদিক দেখবে না, দুই দিক তিন দিক দেখবে—
কারণ সত্যের মুখ নিরপেক্ষ, আদিগন্ত, আর
তার বিকিরণ লেগে সৌন্দর্যের মুখ অপরূপ।

শাদা মেঘ দাবি করে . আমাকেই একমাত্র দ্যাখো,
শঙ্করাচার্যের কাছে রামানুজ আচার্যের কাছে
গিয়ে ফের পরক্ষণে ফিরে এস। অভিজ্ঞতার
সব কালি মুছে দিয়ে কবিতা লিখতে জানি আমি ,
কবিতা লিখতে আর কোনো কবি জানে না, জানে না,
তারা হয় সত্য বলে নয়ত সুন্দর করে বলে,
সত্য ও সুন্দর তারা একশব্দে বলতে পারে না।

শাদা মেঘ দাবি করে : শব্দ সব, শব্দই সোপান,
বাঞ্ছিত পুষ্পের স্তর পার হয়ে পার হয়ে সবাই
পরিণত অম্বুবাহ হয়ে যায়, প্রৌঢ় হয়ে যায়,
কারণ প্রৌঢ়তা মানে পরিণতি। দায়িত্ববিহীন
বালক বা স্থবিরের শ্লথ ব্যবহারে সুকুমারী।
শব্দ মুখ ঢেকে থাকে। শব্দ নারী। নারী চিরন্তনী,
সাময়িক যুবকের অমোঘ ঝঙ্কারে সেই নারী
হঠাৎ দয়িতা হয়, স্বর তার সমস্ত শরীর,

স্পর্শাতীত, অতীন্দ্রিয় : শব্দেরও ইন্দ্রিয় স্পর্শাতীত
অতীন্দ্রিয়। পৃথিবীর অন্তর্নিহিত অরণ্যের
সমুদ্রের স্তরে-স্তরে শহরের শহরতলির
ঘরে-ঘরে আঞ্চলিক সরস্বতী মনসামঙ্গলে
পূর্ববঙ্গগীতিকায় ; প্রেমিকের বুকের শিকড়ে
বধূর মুখের পাশে সম্মিলিত নারীর গুঞ্জনে
মাতাল বন্ধুর স্পষ্ট শুভেচ্ছার অস্পষ্ট সংলাপে
ঢেউ-লেগে-শক্ত-হওয়া বিরহীর ডাকবাংলোয়
আর ঘাস-ওঠা মাঠে সরস্বতীর পরিশ্রমে
ক্লিষ্ট পৃথিবীর ধাতু গলে যায়, পৃথিবীর মাটি
শব্দ হয়ে যায়, শব্দ জুঁই শাদা মেঘ হয়ে আসে ॥

মাতৃভূমি

পাঞ্চেন লামা যা-ই বলুন
বাধা দিন কি না দিন,
আমি এখন ঢেউয়ের মতো স্বাধীন,
আর হব না অনূদিত মুরারি ত্রিভঙ্গ :

তুমিও নিঃশঙ্ক,
চুড়ি খুলে হতে পার মসৃণ করুণ,
মায়ের বাক্সে পুনর্বাসন লভুক তব কঙ্কণ
নিষ্কলঙ্ক।

দুর্ঘটনা ঘটে ঘটুক হ-য-ব-র-ল,
পঞ্চ ইন্দ্রিয়েরে বলি : 'কলকাতা চল'।
সার বেঁধে তিব্বতের ঘণ্টা টানাই বারান্দায়
হাওয়ায়-হাওয়ায় বাজুক জলতরঙ্গ ॥

কনকঅম্বরম্ ফুল, আগে এর নাম তো শুনিনি

আমি কোথাও যাইনি, আমি ঘরের মধ্যে ছিলাম
সারা সকাল, সারা দুপুর বিকেল।
তোরা আমায় এনে দিলি কনকঅম্বরম্।

তোদের কিছু দিইনি, তোরা—কিটি ও বুলবুলি,
কিটি ও বুলবুলির বন্ধু রুপ্লু, মুন্না, মিঠু,
আমায় তোরা এনে দিলি কনকঅম্বরম্।

শরীর, অসুখ, দুপুরবেলায় ঘুম
মেনে নিয়ে শুয়েছিলাম, কিন্তু শরীর বলে
কিছুই যে নেই সে-দৃষ্টান্ত স্পষ্ট দেখলাম :

স্পষ্ট শুধু একটি অভয় সোনালি ডানহাত,
সোনালি এক ক্লান্ত শব্দ, অভয় প্রাচীন শব্দ,
তারা আবার নতুন হল, বালার্করক্তিম

সূর্য উঠল, বালার্করক্তিম
সূর্য ডুবল, রক্তমেঘের উপর
স্পষ্ট শুধু একটি অভয় সোনালি ডানহাত

পাঁচটি আঙুল গায়ে গায়ে লেগে আছে, আকাশ
লেগে আছে ঠোঁটের মতো; মানুষের নিয়তি
একটি হাতের রেখায় রেখায় উশ্রী জলপ্রপাত।

আমার কি ভয়? আমার শরীর বলে
কিছুই তো নেই, আমার শরীর বাতাসে আলপনা,
আমার শরীর শুধু এই ডানহাত;

এই হাতে কবিতা লিখব, আমার নতুন বন্ধু
বিশ্বনাথম্, দরকার হয় তার কাছে ঠিক যাব,
তার সাহায্যে মালয়ালম্ তামিল কানাড়ি

কবিতা তর্জমা করব ; ফুলদানি সাজাব
ভিনদেশী আর দেশী ফুলে। রোডেরিক মার্শাল
স্পেনের কাব্য ভাবান্তরে সাহায্য করবেন।

রাত্রি হবে। স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক বাতাস
আলো নিভবার কারণ হবে। হে পূর্ণ, হে পরম
বলে উঠে অন্ধকারে কলম ছুঁড়ে ফেলব—

কনকঅম্বরম্ ॥

শরীর ফুরিয়ে গেলে

দুই পা আঁকড়ে ধরে আমি তো উত্তীর্ণ হয়ে যাব
ভুবনবিস্তৃত শূন্য থেকে, সূর্যনাভ
ঈশ্বরের পাশে গিয়ে সমধর্মী বন্ধুর মতন
দাঁড়াব। আমার দিব্যদেহ থেকে মেদুর চন্দন
সূর্যের জ্যোৎস্নার মতো ধুয়ে দেবে আকাশ পাতাল ;
আমার প্রিয়ার সঙ্গে ক্ষমাহীন দেহান্তরাল
মুহূর্তেই খসে যাবে, ছিঁড়ে পড়বে পর্দার পাহাড়,
হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসব, কোনো বাধা থাকবে না আর।

আর এই শরীরের আলাদা গড়ন
যন্ত্রণা দেবে না, আমি বিচ্ছেদের কোনো যন্ত্রণার
কষ্ট তো পাব না, শুধু স্পর্ধাঋজু ধূপের মতন
তর্জনী আঙুলটাকে সূর্যে রেখে আনন্দে পোড়াব।

কুয়োতলায়

আরবার তুমি দাঁড়াবে কুয়োতলায় ?
শহরে যাবে না
বাজি পোড়ানো দেখবে না,
বিদেশী কবির
কৌতূহলের শখ মেটাবে না।

কে যে আমায় এখনও কথা বলায়,
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে
ভীষণ মাঘে একান্তে
প্রখর জ্যৈষ্ঠেও
হয়বোলার কর্তব্যের ভান।

সকলি বাঁধা অটুট শৃঙ্খলায়,
একটাও খড়কুটো
নড়াতে আমি পারব না,
একটিও চড়ুই
অধীন করা আমার সাধ্য নয়।

বুক যদিও পাহাড়, তাকে টলায়
আজানু প্রার্থনা—
অন্নকথাও ভাঙতে পারে
পাহাড় দিয়ে পাহাড়,
আর একবার দাঁড়াবে কুয়োতলায় ?

মরমী কমল

সৃষ্টির আড়ালে এক পদ্ম আছে, সৃষ্টির আড়ালে
এক পদ্ম আছে, আর তার পাপড়ি নীলার্দ্র নয়না
ও-আকাশ, আর এই ঘাস-ওঠা মাঠের চন্দনা ;
জমাঘন অভিমানে নিচু হয়ে যখন তাকালে,

অগভীর প্রেমিকের হাতে তুমি প্রেমের গহনা
একে-একে খুলে দিয়ে মমতার প্রদীপ জ্বালালে—
তখন, দেখতে পাওনি, ও-আকাশ তোমাকে আবরি',
এ-প্রান্তরে অবিদিত দরদী লোকের আনাগোনা,
দেখতে পাওনি তুমি ত্রিভুবন তোমার পাপড়ি।

একটি কথার মৃত্যুবার্ষিকীতে

তুমি যে বলেছিলে গোধূলি হলে
সহজ হবে তুমি আমার মতো,
নৌকো হবে সব পথের কাঁটা,
কীর্তিনাশা পথে নমিতা নদী।
গোধূলি হল।

তুমি যে বলেছিলে রাত্রি হলে
মুখোশ খুলে দেবে বিভোরবিত্তা
অহংকার ভুলে অরুন্ধতী
বশিষ্ঠের কোলে মূর্ছা যাবে।
রাত্রি হল।

বুলান মণ্ডল, বৃষ্টি

বুলান মণ্ডল, বৃষ্টি এল
বুলান মণ্ডল, তুমি কী ধান আমার মেপে দেবে,
আমন না রূপশালী ?
ঝড়ে এলোমেলো

একটি উঠান থেকে আরেক উঠানে
ছুটে-ছুটে ভিজে যায় ঘরণী তোমার, মাটি লেপে

রং দিতে গিয়েছিল ঘরণী তোমার, তার মানে
সুখের শিহরগুলি চেয়েছিল ছবি করে নিতে,
এখন বৃষ্টিতে একা ভিজে একাকার, এক-আষাঢ়
এক-আয়ু অকৃতার্থতার
রং শুধু লেগে আছে ছবির মাঝখানে, তর্জনীতে।

ঐ গ্যাখো, ভেঙে গেল ও-কার বাড়ির লাল টালি :
বুলান মণ্ডল, তুমি এখনও কি ধান
মেপে দেবে? এখন কী ধান
দিতে চাও? আমন ফুরিয়ে গেছে, আছে রূপশালী?
না হয় মজুত আছে রূপশালী, কিন্তু অফুরান
যাকে তুমি মনে কর, সারাটা সকালই
সে যদি বৃষ্টিতে ভেজে, তবে
বাড়ি গিয়ে কি জানি দেখবে!

দেরি নয়, আমায় দুহাত ধরে তোর বাড়ি চল্,
আমারও অনেক ধান হাতে ছিল, বুলান মণ্ডল!

ছোটনাগপুর

এক মুহূর্ত থেকে আরেক মুহূর্ত স্বতন্ত্র;
এক পাহাড়ের চূড়া আবার আর পাহাড়ের চূড়া,
টাল খেয়ে যাও পথিক, তবু থেম না একবারও।

দেবতাদের অনড় আসন নক্ষত্রের উপর।
বিপর্যয়ী হাওয়া তোমায় নশ্বরতার সুনাম
রক্ষা করে। দেবতারা অপরিবর্তিত,
সঠিক অর্থে মৃত।

সত্যোমৃত আমি, এখন প্রেতের অরূপ শরীর
আমার, আমি এখন তোমায় মহুয়াডাল থেকে
দেখতে পাচ্ছি। একি, তুমি পাহাড়ে টাল খেয়ে
কাঁদছ, একি, মানুষ হবার সুদীপ্র দায়িত্ব
ভুলে গিয়ে উদ্বন্ধন মেনে নেওয়ার জন্য
হাত বাড়িয়ে মহুয়াডাল ধরার চেষ্টা করছ।

শোন, আমার আত্মহত্যা সুচিন্তিত ছিল,
প্রেমের স্বর্ণশীর্ষ ছুঁয়ে মৃত্যুর প্রতিভা
পরখ করে নেওয়ার জন্যে উনত্রিশে অঘ্রাণ
রাত্রি সাড়ে ন'টার ট্রেনে কি একটা জংশনে
রওনা হয়েছিলাম, গাড়ি যেই ছোটনাগপুরে
থামল, আমি একা-একা স্টেশনে নামলাম।

শোন, তুমি অমন করে মৃতের কণ্ঠস্বর
উপেক্ষা কোরো না, আমার অভিজ্ঞতার মূল্যে
আমি তোমার শিক্ষাদাতা! আর শোন, ঐদিকে
যেয়ো না, ঐ তৃণাপ্লুত মাটির নিচে দুজন
সুস্থ মানুষ সমাধিস্থ। দুজনে যাচ্ছিল :
সাঁওতালি এক তৃপ্ত যুগল। হেমন্ত পূর্ণিমা
দুই শরীরের অন্তর্লীন হরিদ্রাকুঙ্কুম
ছড়াচ্ছিল এই পাহাড়ে ঐ মাঠে! আর আমি
হঠাৎ দেখি ওরা দুজন সুখের প্রহর স্থায়ী
করবে বলে দাদারিয়া নাচের তালে তালে
ঝাঁপ দিল···এক শান্ত পাথর পাজর ভেঙে 'ঐ
দুই জনে এক হয়ে গেছে' ককিয়ে উঠল।

ওরা আমার পূর্বসূরী! অনুকরণ করে
মরেছিলাম আমি। কিন্তু যে-মৃত্যু অস্পন্দ,
যে-মৃত্যু এক অসহায়ের তাল হারা সমাপ্তি,
তার তো কোনো পরিণতির সম্ভাবনা নেই।

দুজনে যেই চলতে চলতে মিলিয়ে যায়, আর
বোবা হাওয়ায় শিহর লাগে, মাতৃত্বের আভা
অনার্তবা ফুলের অঙ্গে ঠিকরে ছলকে পড়ে।

কিন্তু তুমি অবুঝ। ছাখো, আমার উপায় নেই,
আমার ভাষা মানুষরা আজ বুঝবে না, যে-মানুষ
ইহজীবনপ্রান্তে দাঁড়ায়, আমার কথা হয়ত
বুঝতে পারে। যেমন তুমি। কিন্তু তোমার প্রিয়া
কোথায় থাকে, তাকে আমি তোমার অবাধ্যতা
কেমন করে বলব, কেমন করে?

আবার বলি। ছাখো, তোমার ঘরে আসব বলে
ভিখারী আর পাগল আমি। তোমার প্রিয়ার মতো
অনন্যা আজ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। আমি
ঈশ্বরকে বলেছিলাম, তিনি যখন রাজি
তুমি তোমার মৃত্যু দিয়ে আমার ঘাতক হলে।
আমি কি আর জন্মাব না, মা বলে ডাকব না?

চো ওউ, ১৭ই অক্টোবর, '৫৯

তোমরা তো সহজেই দুর্বোধ পাথরে বাঁধো রাখী।
তোমরা তো পাহাড় ডিঙিয়ে যাও মুক্তক ডানায়,
আমরা পাহাড় গড়ি, আর তোরা ধরিত্রীর পাখি
স্বর্গে উপনীত, যবে পুরুষেরা পাহাড় বানায়।

কে বলে সমানভূমি? উঁচুনিচু প্রাচী ও প্রতীচী,
শান্তি, তরুলতা, দিবারাত্রি, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা
ছত্রখান হয়ে পড়ে আছে, আর স্বপ্নের দধীচী
বিপর্যস্ত, দিনে-দিনে বেড়ে চলে বস্তুর অছিলা।

অথচ নিকটে এসে ভালোবাস যখনি কচিৎ,
আমরা সৈনিক হই, কেউ কবি অথবা স্থপতি,
কেউ-বা তেনজিং নোরকে; আর কেউ নিঃশব্দ শহিদ্;
বনানী সবুজ করে চলে যায় কত যে দম্পতি।

হৈমবতী! বিশ্বকর্মা শিরে দিল নীল জলনিধি,
অমল কমলমালা অভেদ্য কবচ বক্ষোদেশে,
রোমকূপে আদিত্যের নিজস্ব কিরণ, মৃত্যু এসে
অর্পিল নির্মল বর্ম। ঈশ্বরের করতলে সিঁথি।

তবে কেন তেইশ হাজার ফুট গিরিশৃঙ্গ 'পরে
চতুর্থ শিবিরে দেহ রাখ, নারী অভিযাত্রীদল?
কামার্ত তুষার ঐ তোমাদের ডানায় বিহ্বল!
আমরা প্রত্যহ মরে বেঁচে থাকি মস্ত খেলাঘরে॥

বাল্মীকির ব্রতে

নিশ্চিন্ত গহনে
তুমি স্থির থাক
সর্পিল শিকড়ে
আগাছা-পরগাছা
স্তরে-স্তরে, তবু
তুমি স্থির থাক
নিশ্চিত গহনে।

চুম্বনের আগে
চুম্বনের পরে
যে-শূন্যের জ্বালা,
যে-শূন্যের জ্বালা

জন্মের জীবনে
জন্মের মরণে ;
স্বরবৃত্ত আর
ত্রিপদীর ফাঁকে
যে-শূন্যের জ্বালা,
সম্পূর্ণ কলসে
জলের দর্পণে
যে-শূন্য নিরালা,
সমস্ত তোমার
দেশজ ভাণ্ডার,
তুমি দয়া করে
বাইরে যেয়ো না।

বাইরে যেয়ো না
বুঝে নিতে শেখ
নিজের বল্কলে

বছর বছর
মুহূর্ত বছর
সমুদ্রের জলে
বৃষ্টিজলকণা
ফুরায় ঘটনা
বাল্মীকির ব্রত
শেষ তো হয় না
সমুদ্রের জল
বৃষ্টিজলকণা ॥

তিনভাগ জলের আগুন

জলে গিয়ে নেমেছিলে, তুমি তার কূলহারা স্মৃতি
একভাগ স্থলের শরীরে
সযত্নে প্রয়োগ কর, শান্ত অবরোহণের রীতি
আর সেই উঠে-আসা তীরে।

অনেক জেলেছ তুমি সম্মেলক মঙ্গলপ্রদীপ;
বঁধুর নয়ন থেকে আলো
ঋণ করে কয়েকটি অন্ধকার শীর্ণ অন্তরীপ
কল্পনার মতো ব্যাপ্ত ভালো

করে দিতে গেছ, কিন্তু কুরঙ্গের কপট আহ্বান;
ঘরে ফিরে শূন্য ঘর, সীতা
দস্যুর কবলে শূন্যে, বিদ্যুৎরুচিরা ম্রিয়মাণ:
কলঙ্কিত মেঘের আশ্রিতা।

অঙ্গন তোমার নয়, সসাগরা এই বসুন্ধরা
তোমার কিছু না, এই ঘর
তোমার সান্ত্বনা কিন্তু বাসা নয়, বিদীর্ণ বাসর।
বিরহ তোমায় তৃপ্তজরা

দেবে বলে বারান্দায় প্রতিবেশিনীর মতো বসে,
সঙ্গে আরো শুভ অনুধ্যায়ী;
নাছ-দুয়ার খুলে তুমি পুরনো আঙ্গিক অনুযায়ী
পালিয়ে যেয়ো না, ক্ষিপ্ত রোষে

অনপরাধীরে দোষী কোরো না কোরো না অন্ধভাবে
বারান্দায় অনেক অতিথি,
অভ্যর্থনা কোরো, তারা সবাই যখন ফিরে যাবে
তুমি একা সঙ্কুচিতা স্মৃতি

ভেঙে ভেঙে মূর্তি গড়, তুমি যাকে একটি সন্তান
দেবে বলেছিলে—সে তো দূর,
যেটুকু দিনান্ত বাকি, গড়ো শুধু খেল্‌না দিনমান
অলীক সে অজাত শিশুর।

বিস্তৃত উজ্জ্বল

জীবন শূন্য হয়ে গেল আলের ধারে এসে,
রেললাইনের সুবিস্তৃত উজ্জ্বল বিনয়,
আকাশপ্রমাণ বড় উঠোন চাষীর বাড়ির বাইরে,
বাড়ির বুকটা বাড়ির মধ্যে নয়।

ঝজুকাঁটার খেজুরগাছে কবেকার কোন্ খুড়ো
ছায়া ফেলে সবচেয়ে আজ সত্য হয়ে বাঁচে,
রুক্ষমুখে অপরিমাণ মমতা অক্রুর,
প্রাচীন সময় নিয়ে দাঁড়ায় ভাইঝি-র খুব কাছে।

আবার ভেবে দেখতে হবে ভালোবাসার কোনো
পরিপূরক আছে কিনা, সঠিক মানুষ বলে
অনেক মানুষ এলে তবু সন্তাপজুড়োনো
কখনো নয় প্রেমিক কিম্বা প্রতারকের কোলে।

বুকে আকাশ, বাইরে আকাশ, দীর্ঘ তালের সারি,
অতীত বর্তমানের পরে তবুও কার হাত
বানায় বাড়ি, বানায় বাড়ি, আবার বানায় বাড়ি,
এক দুই তিন. এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত…

পিতৃপুরুষ

শান্ত সংকল্পঃ সুমনা যথা স্যাদ্‌ বীতমন্যুর্গৌতমো মাভি মৃত্যো।
- কঠোপনিষৎ। প্রথম বল্লী

এখনো দেখতে পাই রোজ বিধুশেখর শাস্ত্রীকে ;
গোল পার্কের পথে যেতে গিয়ে সেই বারান্দায়
এখনো দেখতে পাই রোজ বিধুশেখর শাস্ত্রীকে,
সকাল আটটার রৌদ্র তাঁর পায়ে শিক্ষার্থীর মতো,
আজ তিনি উদাসীন সেই দিকে, একমাত্র নিজের
বুকের ভিতরে দৃষ্টি, অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা,
জিজ্ঞাসার সমাধানে গর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিনী
প্রচ্ছন্ন আগুন তাই শত্রুদের মুখে ছাই দিয়ে :
তাঁর মুখে ছায়া কেন ? মৃত্যু কি নিজেই নচিকেতা
হয়ে তাঁকে জীবন বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করবে ?
সকাল দশটার রৌদ্র মূর্খ ছাত্রের মতো তাঁকে
অপমান করে, তিনি ঘরে ফিরে যান, মাতালের
আর্দ্র চটুলতা থেকে আশ্রমে পালান, আর আমি
স্পষ্ট বুঝতে পারি আমি এক সুভদ্র মাতাল।

আর মাঝে-মাঝে আমি কবীর রোডের রাস্তা বেয়ে
যেতে-যেতে রুগ্ন ক্ষিতিমোহন সেনকে দেখতে পাই,
বয়সবিবর্ণ তাঁর সেই কান্তি, তবু সেই মুখ
পুরনো বটের সদ্য পাতার মতন ফুটে ওঠে,
সেই চোখ চিরন্তন অপীড়িত শান্ত শালবনে
হাওয়ায় রুদ্রাক্ষ গোণে প্রজ্ঞার ব্যথায় কেঁদে ওঠে ;
ভাবাসঙ্গে মনে আসে শান্তিনিকেতনের মন্দিরে
ঝাড়লণ্ঠনের মধ্যে তাঁর মন্ত্র প্রত্যুচ্চারিত :
পিতা নো বোধির স্থির সম্বোধনে ঈশ্বরের মুখ
অনুমান করা যায়। চৈতন্যদেবের অভিমানে
যীশুর আনন্দঘন বেদনায় বুদ্ধের নিয়মে
কবীর নানক দাদু তুলসীদাসের পরিশ্রমে
বহতা নির্মলা নদী। একবার, দু'বার, তিনবার
আঙুল ডুবিয়ে জল ঘোলা করবার চেষ্টা করি ॥

শেষ পাতাটার আগের পাতায়

নীল মলাটের খাতার প্রান্ত ছুঁয়ে
আমার কলম ঝুঁকে পড়ছে, কিছু বলতে চাইছে।

গাঁয়ের শুরু হবার রাস্তা, বাঁশের পাতার গহন,
আর জোনাকির আলোর হিসাব পথ কী করে বলবে ?

এক মুহূর্ত দৈবদয়ায় অনন্ত মুহূর্ত,
কিন্তু শিশির ধরতে গেলেই হাত থেকে যায় ছলকে।

মানুষ, ঘরে-যাবার মানুষ, ঘর-বানাবার মানুষ,
খেলাঘরের মালিক আবার খেলাঘরের পুতুল।

বিখ্যাত এই মানুষ তাঁরি প্রতিস্পর্ধী শক্তি,
ঐ নিসর্গকারুকার্যের কিছুই পেরে উঠবে ?

তবুও প্রাণরোপণ, প্রেমের পরিকল্পনার
আবহমান নিরবসান যুগলমিলনমন্দির !

আর আমি এই খাতার শেষে কূলকিনারালোলুপ,
কিন্তু পাখির সাধ্য কী যে আকাশ মাখতে পারবে ?

মাধুকরী

গেল আমার ছবি-আঁকার সাজসরঞ্জাম,
কোথায় পটভূমি কোথায় পড়ে রইল তুলি,
তুমি আঁকলে ছবি আবার তুমি রাখলে নাম,
ফকিরি সাজ নেওয়ার ছলে ভরে নিলাম ঝুলি,
শুধু নিলাম সব মাধুরী, দিতে পারলাম না।

আকাশ আমায় ক্ষমা, আমার অসীম নীহারিকা ;
প্রিয়া, আমার ক্ষমা, আমার নিরালা অঙ্গনা ;
মাগো, আমায় ক্ষমা, আমার প্রদীপ অনিমিখা ;
মর্ত্যভূমি ভরা আমার আনন্দবেদনা ;
নিয়ে গেলাম সব মাধুরী, দিতে পারলাম না।

নিষিদ্ধ কোজাগরী

উৎসর্গ

শ্রীমতী নীহারিকা দাশগুপ্ত

এই মুহূর্তে যে-মানুষটি চলে যাচ্ছে আমি তাকে মন্ত্রের ভিতরে তুলে নিলাম।
তুমি এক থেকে দশ গোনো আমি তারি মধ্যে দেব তার মাথায় মুকুট,
সূর্যের সম্মান, লক্ষ কাশফুল, আপন অস্তিত্ব থেকে প্রাত্যহিকতার অন্ন,
যে-জ্যোৎস্না কখনো পায়নি কারো থেকে, ছেয়ে দেব ম্রিয়মাণ শিরায় শিরায়,
ছন্নছাড়া—দেখ ওর চলনবলনে ছন্দ যা থেকে কখনো কেউ ফিরতে পারে না
মৃত্যুসমতলে ; ক্ষমা, তা-ও দেব, যেহেতু কখনো ক্ষমা পায়নি কখনো
তাদের কাছেও যারা ওকে শুষে নিয়েছিল বছর-বছর ;
বুঝেছি, ভেবেছ আমি ওকে শুধু নির্বস্তুক গরিমা দিয়েই ধাপ্পা দেব ;
কেন তুমি একথা বোঝোনি আমি সবশেষে দেব তোমাকেই
ওর খিন্ন হাতে তুলে, জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দান, তোমাকেই,
মন্ত্রের ভিতরে আমি তোমাদের দারুণ আরামে রেখে মন্ত্রের বাহিরে
শীতের উঠোনে কাঁপব, ডেকো, ওকে ভয় করলে, সুন্দরের দরকার পড়লে।

ঈশ্বরের প্রতি

যেদিকে ফেরাও উট, যত দূরে-দূরে তুমি কীর্ণ কর তাঁবু,
মানুষের বুকের পালক নিয়ে হরেকরকম পাখি তোমার আকাশে
ওড়াও যতই, কিংবা এদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে গিয়ে
পরীদের খাদ্যের সংস্থান কর, প্রসন্ন হবার মন্ত্র জান ;

যেদিকে ফেরাও তব অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের বিবিধ কৌশল ;
যদি পড়ে থাকি নিষ্কাশিত-আশা খড়, ব্যাপ্ত বালির শয্যায় ;
যতই রাঙাও একচক্ষু সূর্য একচক্ষু চাঁদ,
নিয়তির নীলাকাশে কৃষ্ণপতাকায় রাত্রি উত্তোলন কর ;

যে-ধারেই ফেলে রাখ আমার শরীর—পুবে, পশ্চিমে, শ্মশানে ;
কেটে দিতে চাও উল্কি ডানহাতে, জোর করে দীক্ষা দিতে চাও—
অথবা উচিত শিক্ষা দেবে বলে পাপী কর পরিতাপী কর ;
প্রেমিকের স্বাভাবিক গভীরতা নষ্ট করতে ব্রতী হও ;

মানুষের ঘরনীকে মধ্যরাতে টেনে নিয়ে তোমার মন্দিরে
যতই লেখাও আরো থেরীগাথা, সিঁথি 'পরে কর অবৈধতা,
যেদিকে ফেরাও উট, এই দ্যাখো করপুটে একটি গণ্ডুষ
বিশ্বাসের জল, তুমি পান কর, আমি জল না খেয়ে মরব ॥

পথের মন্ত্র

আমরা
পান্থশালার বারান্দায়
বসব না।
সূর্য
অরুণ বরুণ নিয়ে যখন
দিনান্ত ;

চন্দ্র
কিরণমালা নিয়ে যখন
নিভন্ত ;

আমরা
পান্থশালার বারান্দায়
বসব না ॥

আমরা
দ্বিতীয় চুম্বনের আশায়
থাকব না ।

খুলল
মেঘের দুয়ার, ঐ আমাদের
সিংহাসন ;

নামল
বোশেখি ঝড়, বৃষ্টি ভেজায়
সিংহাসন ;

আমরা
দ্বিতীয় চুম্বনের আশায়
থাকব না ॥

চৌকাঠ পেরিয়ে

একবার মাঠে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে, একবার
বারান্দায় যেতে-যেতে নিভন্ত সূর্যকে উস্‌কে দিয়ে
চৌকাঠ পেরিয়ে এসে উদ্বেলিত নাটকীয়তায়
মধ্যে খেলা শেষ কর। অধিক বৎসর বেঁচে লাভ ?
কখনো বঁধুর কানে রোজরাত্রে একই গোলাপ
আবৃত্তি কোরো না। শুধু মস্ত বড়ো বাগান বানিয়ে
খরগোশ আদর করে ছেড়ে যাও আপন সংসার ॥

দুর্বলতা

রেললাইনের ওপার থেকে একটি শিশু এসে
আমাকে রোজ সঙ্গে করে নিয়ে
ক্যাম্পে চলে যায় ;
প্রথম ছাউনি পরের ছাউনি তারি সঙ্গে লাগা
আকাশসর্বস্ব ছাউনিটাতে
হিড়হিড় করে সে আমায় আমন্ত্রণ করে
ঢুকে গিয়ে সকল-শুভ্র জননীটির কাছে
বলে : "মাগো, ছাখো ছাখো কাকে আজ এনেছি,
আর আমাকে বকতেই পারবে না !"

একটি ফুলের প্রদর্শনীতে

প্রদর্শনীতে একটিই ফুল রাখা হয়েছে ;
সবাই দেখছে জিনিয়া, গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা—
কেউ ডালিয়ার ব্যাসার্ধ মেপে প্রতিযোগিতার
স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বালকগোলাপ দেখে বেড়াচ্ছে, কারো
চোখের উপর গুচ্ছ-গুচ্ছ মাধবী খেলে বেড়াচ্ছে,
কিন্তু এরা তো কেউ জানল না এই
প্রদর্শনীতে একটিই ফুল।

নমুনা-শিকারী যারা আকর্ণ
দীর্ঘলোচন তাদের মধ্যে
বিশেষজ্ঞেরা আঘ্রাণ আর সন্দর্শনে
কোনটি জরুরি ফুলের মূল্যায়নে
ইত্যাদি নিয়ে পর্যালোচনে মত্ত তা সত্ত্বেও
প্রদর্শনীতে একটি যে ফুল।

সে কথা এড়িয়ে প্রকাশ্য থেকে প্রকাশ্যতর
কুজ্ঝটিকায় ভাসছে

জ্ঞাতনাম্নীরা সুযোগ নিচ্ছে একটা ফুলকে
এক-একটা ফুল বানিয়ে দু'হাতে ছানছে দলছে
মেরি-গো-রাউণ্ডে প্রতিটি ঘোড়ায় দু'জন করে
দু'জন-দু'জন খেলছে।

বীতশ্রদ্ধ প্রদর্শনীতে একটিই ফুল হাতে-হাতে ঘুরে
অজ্ঞাত এক অন্ধ মেয়েকে হাতড়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

চন্দনিয়া

একদিকে ফুল ফোটার মধ্যে চন্দনিয়ার মুখ
দেখতে পেলাম, চন্দনিয়া সেই
সীতারাম সর্দারের মেয়ে সীতারাম সর্দারের
মনের আরাম প্রাণের শান্তি আত্মার আনন্দ।

দুই দিকে জলঝরার মধ্যে চন্দনিয়ার মুখ
দেখতে পেলাম, চন্দনিয়া সেই
পাথরকালো কৃষ্ণকালো ভীষণ জলের ঝিনুক
অথচ সেই গহীন সাগর দেখতে পেলাম না!

উৎফুল্ল গোধূলি

সকলের ছোটোবোন চলে যায় ছোটো-ছোটো হাতে
কমলালেবুর গুচ্ছ নিয়ে! আমি আধখোলা বই
কোলের উপর রেখে ঈক্ষণ করেছি জানালাতে,
এখন আমার জ্বর কমে গিয়ে সাতানব্বই।

এখন আমার দিকে দিগ্বিদিকে উৎফুল্ল গোধূলি,
একথা প্রমাণ করতে আলমারি থেকে
পূর্বসূরিদের পুঁথিগুলি
নামিয়ে আনতে গিয়ে পড়ে যাব বেঁকে

খাটের পিছনে ঐ দুরূহ ফাটলে।   অরুন্ধতী
উদ্‌গ্রীব হে রাজবৈদ্য, তোমার ওষুধ
আমাকে ধরবে না আর, পাহাড়ে দাঁড়িয়ে দ্রুতবেগে
চোরের মতন আমি বলে উঠব 'উৎফুল্ল গোধূলি' ॥

সারা শহরে কুয়াশা

সারা শহরে কুয়াশা
মস্ত বড়ো ছাউনি ফেলে
কেড়ে নিল আমার ভাষা,
আমায় তুমি স্তব্ধ থাকতে দাওনি,
আমার হাতে কলম দিলে, প্রদীপ জেলে।

পাঁচমাত্রার ছন্দে
যেই আমি কুয়াশা
ধরতে গেলাম, বাণীবিহীন মন্ত্রে
ছ'মাত্রা কুয়াশা এসে ছিঁড়ল আমার ছাউনি ॥

শীতের আকন্দ

শীতের আকন্দ
ফুটি-ফুটি ;
ফুটে উঠল দুটি
শীতের আকন্দ।
এবার, এইবার
দুঃখ দাও, রাত্রি দাও,
ঠাণ্ডা।

নিজের নামের বানানটা
ভোলাও, ভোলাও,
দাও ভেঙে বারান্দা ;
তবু আমার আনন্দ, আমার
আনন্দ ॥

যে-রাখাল দূরদেশী

রাখালিয়া গীতি হাতে নিয়ে ভার্জিল
সারা বিশ্বেরে শোনালেন সেই গান,
যমুনাপুলিনে কৃষ্ণের সম্মান,
রাখালের হাতে গীতিকবিতার মিল।

গোধূলি ঘনায়, মিলনে বিরহ জাগে,
সেই তো ধরণী শোণিতে আবহমান ,
কে তবু বলল ট্রামে উঠবার আগে :
"এবার কিন্তু আঙ্গিক বদ্‌লান।"

তবে শোনো, এই নগরীর সন্তান
আমিও, অথচ যে-রাখাল দূরদেশী,
আমি তার কাছে সঁপেছি মনপ্রাণ,
কেননা শহরে পাঠভেদ বড়ো বেশি ॥

নাগরিক

কার্পেটে ঢাকো রক্তের মোজেইক,
সে যেন মাড়িয়ে যায়,
দেখতে দিস্‌নে রক্তের কারুকাজ ;

ঘরে বধূ নেই, বুড়ি মহুয়ার গাছ
পুবের বারান্দায়
কেঁদে মরে যায়, ঘর ভেঙে যাবে ঠিক।

জীবনে তোমার যত ছায় বল্মীক,
গভীর জলের মাছ
বাল্মীকি এসে ততই কথা সাজায়।

বুকের ভিতরে লুকাও গন্ধরাজ
শিল্প যাকে বাঁচায়,
সবচেয়ে ভালো সুভদ্র নাগরিক ॥

মুখ

নদীর ওপারে আছ, কতদিন হল।
সনাতন ডাকহরকরা
সেতু বেয়ে পরিশ্রম করে না তো আর,
সে বুঝি আর কোথাও বদলি হয়েছে।

এখন নদীর বক্ষে জোয়ার বহে না, খুব ভালো।
কিন্তু একেবারে ভাঁটা ভালো নয়; তোমার অর্চনা
হয় না অনেক দিন, স্মৃতি দিয়ে অর্চনা হয় না;
আজকাল অকুল মমতা পাই মানুষের, নিসর্গের কাছে,
সৈকতে স্নেহ বিতরে মাতামহ তমাল পিয়াল।

আমি নিজে স্নেহ করি, ধর্মযাজকের অনুযায়ী
ঘষে-মেজে আয়নাকে স্বচ্ছ করতে চেষ্টা করি,
হাসপাতালেও যাই প্রত্যহ সন্ধ্যায়,
অন্ধ আতুর দেখলে সেবা করতে শিখেছি এখন।

মাঝে-মাঝে রচিত উল্লাসে মাতি, তুলসীতলায়,
পল্লীবালিকার হাত থেকে আনি মঙ্গলপ্রদীপ,
প্রণাম করতে শিখি কিন্তু কী ভীষণ অন্ধকার,
কী করে আরতি করি মুখ যদি দেখতে না পাই ?

দুঃখ

তবু কি আমার কথা বুঝেছিলে, বেনেবউ পাখি ?
যদি বুঝতে পারতে
নারী হতে।

আমাকে বুঝতে পারা এতই সহজ ?
কারুকেই বোঝা যায় নাকি !

শুধু বহে যায় বেলা, ঈশ্বর নিখোঁজ ;
কিংবা বুঝি এ-দুঃখ পোশাকি,
না-হলে কী করে আজও বেঁচে আছি রোজ,
বেনেবউ পাখি !

প্রেমিক

ললাটে তিলক যেন নব শশিকলা,
অমূর্ত ধূপ শীর্ণ শরীরে জ্বলে,
বেণীর রন্ধ্রে মালতীর শৃঙ্খলা,
কারো চুম্বনে প্রাঞ্জল কজ্জলে
সে যে পৃথিবীর, এই কথা বুঝলাম ;

ক্ষীণ গোড়ালিতে চূড়ান্ত ভর করে
পালঙ্কে উঠে বেণী খুলে দেখি, একি,
চুলের ভিতর মঞ্জুষা-কন্দরে
আমার চেয়েও তরল চটুল মেকী
আমার বন্ধু অর্ধেন্দুর নাম।

কুঞ্জমাধবী

বুকের উপরে উঠে এলে কেন মাধবীকুঞ্জলতা ?
আমি বহুদিন ঘটনা ছেড়েছি, সঙ্গে-সঙ্গে স্মৃতি,
ঘটনা যখন শেষ হয়ে যায় শেষ হয়ে যায় স্মৃতি,
আমি সেই কথা অনুভব করে নবীন ক্ষমতাবলে
বরফের গুহা রচনা করেছি, আমি নিজ বাহুতটে
মাঝে-মাঝে শুধু ভোরের টগর ঝরতে দিয়েছি, তাকে
নিরুপদ্রুত রুদ্রাক্ষের কোমল উপমা ভেবে ;
আমি মাঝে-মাঝে সংসারীদের গৃহগহ্বরে গিয়ে
সদ্য শিশুকে আদর করেছি দেবতার দূত বলে ;
তুমি তবে কেন ক্যালেণ্ডারের পিছন-দরোজা বেয়ে
বুকের উপরে উঠে এলে আজ মাধবীকুঞ্জলতা।
মাত্রাবৃত্তছন্দে আমায় কবিতা লেখালে কেন ?

পাশের বাগানে

অনীতা কি তবে মরেই গেছে ?
ঘড়িতে ভ্রমর নেচে চলেছে……
অনীতার মুখ কেন তবে অত নিস্পন্দন
ভূমার মতন, ভূমার মতন ?
ভাবতে-ভাবতে ধূর্ত প্রেমিক করদ আলিঙ্গন
তুলে নিয়ে কাঁপে বালাপোশে, চাপা ঠোঁটে
পাশের বাগানে কার্পাস ফুল খিলিখিলি হেসে ওঠে।

অনীতা কি মৃত ? অনীতা কি মৃত ?
ভাবতে-ভাবতে উঠে দাঁড়াল ;
কঙ্কণে স্বেদবিন্দু ক্ষরিত
এই দেখে পা বাড়াল
চৌকাঠে সেই মুক্ত প্রেমিক, ফিরে তাকাল না মোটে,
পাশের বাগানে কার্পাস ফুল হো-হো করে হেসে ওঠে

হাওয়ার ভিতর

তোমার নামে যে-মেয়েটির নাম
আজ নিশীথে কপালে তার স্পষ্ট এঁকেছিলাম
চুম্বনের শুক্লা জয়টিকা।

'এঁকেছিলাম' বললাম, কেননা,
এরি মধ্যে সে-জয়টিকা অপসারিত
হাওয়ার ভিতর, তার পরাজয় অবধারিত।

বহির্দ্বারে তোমার বেবি ট্যাক্সি উঠল বেজে,
শুনে আচম্বিতে তোমার প্রতিনায়িকা
হাওয়ার ভিতর সঞ্চারিত, কিন্তু ঘরের চতুষ্কোণী মেঝে
থেকে ঘরের চৌখস আকাশ
তার পরিচয় ব্যাপ্ত করে, যেমন সারেঙ্গিতে,
সাগিরুদ্দিন ধরে রাখেন লুপ্ত স্বরাভাস ॥

জল, ভূমণ্ডল, আত্মা

"আত্মার বয়স কতো, মাঝিভাই ?" মধ্যরাতে উঠে,
রমেন জিজ্ঞাসা করে : "তুমি কি কখনো করপুটে
আত্মা রেখে তার উত্তাপ গ্রহণ করেছ ? বল তার

বাহির শীতল কেন ? যেমন এ নদীর কিনার,
নিঃসাড়, সহস্র দুঃখে যা কাড়ে না, তেমনি আত্মার
নম্র প্রচ্ছদপট ? সে মলাট যদি যেত টুটে
তবে কি রবীন্দ্রনাথ মরতেন না শমী-র মৃত্যুতে ?"

নারীশ্বরী

আত্মনিহত দুটি মৃতদেহ
রাঢ়ভগবতীপুরে
দুপুরবেলায় পৌঁছিয়ে গেল
নদীর উজান ঘুরে।
একটি পুরুষ, তার চোখে তবু আক্রোশ, রুক্ষতা :
অন্যটি নারী, তার চোখেমুখে অটুট স্বর্ণলতা ॥

ঘৃণা

তবু পুব হাওয়া না বুঝে তর্ক করে,
বোঝে না আমার উপায় ছিল না কোনো,
বোঝে না আমি যে নমিতার শেষ ঘরে
গিয়েও পারিনি দায়িত্ব নিতে, ঝড়ে
বল্লরীবাহু এবং আচ্ছাদনও
মেলেছিল, তবু নিরাপদ অন্তরে
চুম্বন করেছিলাম রক্তব্রণ।

কেননা, নমিতা প্রথম কক্ষে শুধু
উপাসনা নিতে রাজী হয়েছিল, পূজা
তাকে করেছিল দিগ্বধূ অতিসুদূর ;
অবশেষে কেন তিমিরে সে দশভুজা

হতে গেল ? কেন ভুজঙ্গমৃণালের উদ্গান
কাঁপা সরসিজে ব্যাপ্ত ওষ্ঠাধরে ?
জ্ঞানশূন্যতা করল নিজ অনুজা
প্রথম ঘরের নমিতাকে শেষ ঘরে ॥

সে

এক চিল্‌তে রৌদ্র বেয়ে সে কিছু বলতে এসেছিল ;
তাকে দেখে পাড়াসুদ্ধু টি-টি পড়ে গেল, আগে যার
নিশ্বাসের চন্দনে পাড়ার
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ শোভনতা শিখে নিত, তারা
তাকে দেখে ছি-ছি করছে : "কী লো
কেমন আছিস্ তুই ?" এই বলে একমুঠো ছাই
ছিটোয় নবোঢ়াবৃন্দ তার মুখে ; এক চিল্‌তে রৌদ্রের চৌকাঠে
লাথি মেরে পাড়ার প্রবীণতম ব্যবসায়ী—টাকার পাহাড়—
বলে : "এক চিল্‌তে রৌদ্র, আমাকে দিয়ে দে মেয়েটাকে,
রাত্রে কাছে-কাছে রাখব, আমি ওর স্ত্রী-শিক্ষার খাতে
ভালই বরাদ্দ করব"—কথা শেষ না হতেই কাঁখে
সুখ্যাতির বড়ো-বড়ো কল্‌সি নিয়ে—হিন্দি ফিল্মে যথা—
ভাড়া-করা স্ত্রীলোকেরা কাছে এসে তার দেহ থেকে
অনর্গল জল ভরতে চেষ্টা করে—আর অকস্মাৎ
যতেক অজাতশ্মশ্রু ছেলে-ছোকরা সন্নিকটে গিয়ে
মেয়েটির নাক মুখ চোখ বুক হাত
ছুঁয়ে-ছুঁয়ে দেখতে চায়, এক চিল্‌তে রোদে
সামাজিক সমর্থনে সিঁধ কাটবার চেষ্টা করে ;
পৈতৃক ভোজনালয়ে তৃপ্ত যত যুবক-বাহিনী
নিজেদেরই আঙুল কামড়ে ছেঁড়ে অক্ষম আক্রোশে ;
'মহিলা-পকেটমার'—তাকে লক্ষ করে ভিড় থেকে
বলে উঠল আপাতজননীজাত একটি সন্তান ;

বয়োভারনত পিতা যেরকম শেষবারের মতো
হাটের ভিতরে খোঁজে যথার্থ মানুষ, অবশেষে
না পেয়ে মেয়েকে নিয়ে ক্ষতস্থানে চলে গিয়ে বাঁচে,
সেই মতো মেয়েটিকে বুকে নিয়ে এক চিলতে রোদ
আমার সকাশে এসে আবার অদৃশ্য হয়ে যায় ॥

ব্রত

আমি এক-একবার তোমার সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করব ভেবেছি
ভীষণ লোভ হয়েছে পায়ের পাতার নরম ছুঁতে
হাতের উপর চাপ দিয়ে লুব্ধ যুবকদের ঈর্ষা কুড়োতে
ভুরুর জোড়াসাঁকোয় চুম্বনের ত্রিকোণ স্বর্ধ রোপণ করতে
এক-একবার তোমার সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করবার কথা ভেবেছি।

কিন্তু পরক্ষণেই দীপংকর-বিতৃষ্ণায় সরে এসেছি বলে
নিজের উপর ধিক্কার বেজে ওঠে,
তোমার শতনরী হারের বৃশ্চিক চিরাচরিত দক্ষতায়
একজন পুরুষের চুম্বনের বিষ অন্য পুরুষের মুখে ঢেলে আসে,
এমন কি সেই সব পুরুষের নামও জান না তুমি।

তুমি কি আমার সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করবে বলে কখনও ভেবেছ?
আমার সংলাপের অঝোর মুকুলে স্নান করতে
আমার ব্রততী-পৌরুষের বিরোধাভাসের আস্বাদ নিতে
চরিত্রের গঙ্গোত্রীতে স্নান করে রক্তাভ তসরের শাড়ি পরে নিতে
ভাবনি, কেন না সমর্পণকে তুমি জরতীর ধর্ম বলে মনে কর!

এক বেশ্যা অনায়াসে ভিতরমন্দিরে ঢুকে যায়

বুদ্ধমন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেলে
এক বেশ্যা ঢুকে যায় পিছন-দুয়ার ঠেলে
দাঁড়ায় বুদ্ধের ঠিক পাশে ;
দুটি দেবদারু দেয় দ্বারপ্রান্তে সযত্নে পাহারা
কেউ যেন বুঝতে না পায়,
শ্রমণ বুঝতে পারলে যাচ্ছেতাই হবে,
এই জেনে চত্বরের মাঝখানে ভূস্পর্শমুদ্রায়
জাপানী গাছের চারা শান্ত পরিবেশ এঁকে তোলে ;
গাছ, ফুল, শ্রমণের ঘন ঘুম যাকে
ভীষণ সাহায্য করে সে-নিষিদ্ধ নারী
বুদ্ধকে কী বলেছিল প্রচলিত ভিক্ষুর বিষয়ে ?

পাহাড়চূড়ান্তে এসে

পাহাড়চূড়ান্তে এই শরীরহীনতা
মেনে কি নিয়েছ তুমি, ঈশ্বরী আমার ?
বাঁ-দিকে একটি চূড়া ছোরার মতন
নীল দিগন্তকে ফুঁড়ে এফোঁড়-ওফোঁড়
করে দিল। আত্মা ভাল আত্মা ভাল বলে
চেঁচিয়ে উঠেছে কেউ, ঘাড় ফেরালেই
সে অনুপস্থিত। এই শরীরহীনতা
কৃত্রিম ভেবেছ তুমি, ঈশ্বরী আমার ?

পুরুষ সহজে যায়, আরেক সোপান
সানন্দে ডিঙিয়ে আমি চলে যেতে পারি,
সব পুরুষের বুকে একহংস আছে,
পড়ে-পড়ে একহংস ঘুমোয় ঘুমোয়,

তারপর অকস্মাৎ সুনীল শূন্যের
গোপন দংশনে জেগে ভেসে চলে যায়,
আমিও পালাতে পারি, আরেক সোপান
লঙ্ঘন করলে আমি মুক্তি পেতে পারি,
তুমিও কি সঙ্গে যাবে, ঈশ্বরী আমার ?

আর কাকে সঙ্গে নেবে ? আমার প্রাক্তন
চিঠিগুলি, আমার তরুণ বয়সের
প্রতিকৃতি ? হা ঈশ্বর ! ঐ যে দুহাতে
বাড়িয়ে আমাকে ডাকে সবার ঈশ্বরী,
তার কোনো তারিখের অনুষঙ্গ নেই,
প্রেমিকের চিঠি ছবি উড়িয়ে-পুড়িয়ে
বিধবা সেজেছে সেই শুক্লা সরস্বতী ;
কে পাবে আমায় শেষে ? তাই ভাবি মনে ;
আমার ঈশ্বরী, নাকি সবার ঈশ্বরী !

স্বপ্নিনী

স্বপ্নী চোখের একটি মেয়ে সকলকেই স্থলপদ্ম জানে,
এই নিয়ে তার সঙ্গে আমার বিবাদ বাধে, সারা দুপুর বেলা
ফেরিঅলার স্বর ছাপিয়ে কানে আসে নৃশংস আওয়াজ :
বাড়িউলির প্রাচীন রীতি।
কিন্তু তবু স্বপ্নিনী মেয়েটি
কী বুঝেছে সে-ই তা জানে, সে আমাকে বল্লভ দেখাবে,
এই বলে খুব নরম-নরম শাসন করে, দুহাত ধরতে দেয়,
এমন কি, তার ঘাড়ের কাছে যখন নাসাস্ফারিত আগ্রহ
জেলে ধরি : 'আমি তোমার ? আমি কী সেই বল্লভ তোমার'?
সে আমাকে তখনও এক নিরপেক্ষ স্থলপদ্ম জানে ॥

বৈদেহী

প্রথম পাগ্‌ল করার মতো বিবেক এল মনে,
চক্ষু বুজে সেই নারীকে নিলাম আলিঙ্গনে ;
সে কি হর্ষ, প্রাত্যহিক অপস্মারগুলি
পালিয়ে গেল পিলসুজের অঙ্গুলিহেলনে।

'আমায় তুমি অভিজ্ঞতায় ভুক্তভোগী কর'
বলে আমি প্রথমে তার উরোগুঞ্জাহার
ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দিলাম জানালার বাহিরে :
কিন্তু তবু তার আনন্দ আকাশগঙ্গার।

'নির্মঞ্ছন কর আমায় তোমার কালো চুলে'
বলতে গিয়ে অকস্মাৎ আমার স্বরলিপি
নিখাদ গুহায় অবরুদ্ধ ; অনর্পিত তবু
বিস্ফারিত ইন্দুলেখা ব্যক্ত বাহুমূলে।

'আমার কাছে সূর্য আছে' কৃত্রিম শপথে
কাছে এনে দিলাম তাকে অন্তর্বেদনা,
তবু অবাক, আঁখিপদ্মে ছিল না ভর্ৎসনা,
অমুক্ত আকৃতি ছিল রক্তকোকনদে।

'তুমি আমায় এখনো কি নম্র কিশোর ভাব ?'
এই বলে যেই অস্নাত মুখ বিকীর্ণ আঙুলে
ম্লান করালাম, সে কি তৃপ্তি, অন্ধকারে হল
সুবিনীত গৃহদাহ সিতকঞ্জনাভ ।

'কে তুমি ? কমলে কামিনী ? কার ঘরে বিদ্রোহ
সংঘটিত করে এলে ?' এই বলে ফুকারি ;
আচম্বিতে চুম্বনের বৈশ্বানরে দেখি
আমায় রেখে গিয়েছে সেই স্বাবলম্বী নারী।

সেবিকা গোলাপ

গোলাপ এখনো আরো-কিছুকাল বহাল থাকুক,
ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষা যেমন, তেমনি ;
গোলাপ, তুমি কি ইংরেজি ভাষা ?   কোনো আতাতুর্ক
বলতে পারেন তুমি তাঁরি দেশে জন্মালে, ধনি ;
কিন্তু তিনিও মানতে বাধ্য, দ্বিতীয় জন্ম
অধিক অমোঘ, তুমি প্রধানত ঔংরেজিনী,
তোমারি দয়ায় ভাষান্তরের দৌলতে আজ
রোমান্টিক ও প্রতীকী কাব্যে তোমাকেই চিনি ।

গোলাপ, তুমি তো ইংরেজি ভাষা ।   ত্রিলোকে যখন
তিব্বতী পুঁথি-নিহিত পদ্ম দুর্লভ আজ,
পেপারব্যাকের অপালা গোলাপ, ফুলদানি মন,
এবং মণীষা পাপড়িতে ভরে ।   যখন সমাজ
বলে কিছু নেই গোষ্ঠী অথবা যজন-যাজন
বিক্রপার্হ, পুরাণস্মৃতির স্বপ্নস্বরাজ
লুকাই গোলাপগহনে, আমার কবিতাকে আজ
ঢাকুক, সেবিকা গোলাপ, তোমার শাদা অ্যাপ্রন ॥

একটি ঘুমের টেরাকোটা

ট্রেন থামল সাহেবগঞ্জে, দাঁড়াল ডান পায়ে ।
ট্রেন চলল ।   থার্ড ক্লাসের মৃন্ময় কামরায়
দেহাতি সাতজন
একটি ঘুমে শুব্ধ অসাড় নক্‌শার মতন ;
এ ওর কাঁধে হাত রেখেছে, এ ওর আদুল গায়ে
সমবেত একটি ঘুমের কমনীয়তায়
গড়েছে এক বৃত্তরেখা, দিগ্বধূর স্তন ;
পোড়ামাটির উপর দিয়ে আকাশে রথ যায় ।

আলোর ভিতরে চোর আছে

ধিকিধিকি সন্দেহের আগুন উঠল জ্বলে
পাড়াপড়শীর ঝাউবনে ;
শহরের আশেপাশে পাহাড়ে-পাহাড়ে মাথা ঘষে,
কাকে যে আহুতি দেবে কৌতূহলের হুতাশনে।

কাকে যেন কাছে পেলে বিঁধে ফেলবে দারুণ বল্লমে,
তার আগে একটি দুরূহ কথা প্রশ্ন করবে :
"কাকে তুমি ভালোবাসো ?   কাকে ভালোবেসে পূর্ণোদ্যমে
রোজ রাত্রে চিঠি লেখ ছোটো-ছোটো খরোষ্ঠী হরফে ?
উত্তর পাও না বলে মরমে-মরমে
মরে তো আছই তুমি, আমাদের হাতে আজ সম্পূর্ণ মরবে।

"তুমি অতিশয় মূর্খ, যার হাতে চিঠি ফেলতে দাও,
সে-কিশোর দু-তিন কাহন
পারিতোষিকের লোভে বিকিয়েই দিতে পারে গাঁও,
অথবা নিজের ছোটবোন ;
আমরা দোভাষী ডেকে তোমার সমগ্র পত্রাবলী
পড়ে ফেলে বসে আছি, আমাদের মত জানতে চাও ?

"তোমার বিশ্বাস যদি মেনে নিই ; তবে আমাদের
মেনে নিতে হয় মৃত্যু, আশু অন্তর্জলি ;
কারণ, তোমার কাছে দুঃখ-আস্বাদের
অর্থ শুধু পরিশুদ্ধ হয়ে যাওয়া. শুদ্ধতার জের
টেনে তুমি নিতে চাও প্রেমে, পরিণয়ে, পুংশ্চলী
রমণীর সন্তান প্রসবে ; এ যে উন্মাদ কাকলি।

"তাছাড়া তোমার লক্ষ্য সরে যায়, যায় সরে-সরে।
কিছুতে সন্তুষ্ট নও, নরোত্তম সাজো

ঐশ্বরিক অসন্তোষে ; তুমি আমাদের হাত ধরে
পার করে দিতে চাও যেখানে বিরাজো,
অথবা যেখানে নিজে যাবে তুমি—আশ্বিনের ভোরে।
তুমি যাও, আমরা থাকি ঋতুপরিবর্তনে, নগরে”—

ধিকিধিকি সন্দেহের আগুনে শহর
জ্বলে যায়। স্নায়ুযুদ্ধ। বৃদ্ধনিয়োজিত
যুবসম্প্রদায় ঘোরে, আলোর ভিতরে আছে চোর,
খুঁজে হাওয়াকেই করে প্রহারে-প্রহারে জর্জরিত।

সুদেষ্ণা আমার

আলিঙ্গনের মহোৎসবে
সকলের হৃদকমলে হাওয়া,
রাঙা কামসূত্র ওড়ে বারান্দায়
শরীরে আনন্দ কারো ধরে না ধরে না
ঘরের জমিন ভেঙে ফেটে পড়ে উদধিমেখলা
আলিঙ্গনের মহোৎসবে।

এরি একপাশে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে সুদেষ্ণা একাকী
পোর্টিকোর নিচে ;
বোধিপর্ণের মতো এ যে বড়ো দারুণ শীর্ণতা
সুদেষ্ণার, তার
দক্ষিণ হাতের অরত্নির দীর্ঘ অনশনসহিষ্ণু দীধিতি,
কোমরের তূণে
ক্ষমার মতন স্নিগ্ধ রক্তাভ অক্রোধ কাঞ্চীদাম ;
বাঁ-পায়ের তিনটি আঙুল তৃষ্ণী বৈরশূন্যতার অন্যনাম,
কে ওকে স্পর্শ করবে ?

সুদেষ্ণার মাকে ছাখো, তিনি
সপ্রতিভ, ততোধিক সপ্রতিভ একটি যুবক
রোচিষ্ণু চিবুক ছুঁয়ে ললন্তিকা গলার হারের
প্রশংসায় গলে গিয়ে অন্য ললনার দিকে হেসে চলে যায়,
সুদেষ্ণার মাতা কেন একা-একা সুন্দর হবার
মন্ত্র জানে না ?
সুদেষ্ণার মাতা কেন একাবলী হার ছিঁড়ে ফেলে
হিংসুক নক্তক পরে অন্য যুবকের অন্যমনস্কতার
সুযোগ নিলেন অবহেলে ?

আলিঙ্গনের মহোৎসবে
রাশি-রাশি কূর্পাসক উড়ে পড়ে পঞ্চশরের মন্ত্রণায় —
একপ্রান্তে, একা,
একমাত্র ব্যতিক্রম সুদেষ্ণা আমার
আলীঢ় ভঙ্গিতে
দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে
অঝোর বৃষ্টিতে ভিজছে, বৃষ্টি এসে কৌতূহলী দাঁত
বসায় ঘাড়ের মাংসে, পীতশিখা সকরুণ তেজে,
প্রতিফলনের বস্তু অবলুপ্ত হয়ে গেছে জেনে,
জেনেও অটুট
আলীঢ় ভঙ্গিতে
এ-ঘরের উৎপীড়িত লজ্জা অপহৃত
সারি-সারি নির্যাতিত নারীদের জঙ্ঘায়-জঙ্ঘায়
বুদ্ধমূর্তি জেলে ধরে, বিদ্যুতের মতো আচম্বিতে

সুদেষ্ণা আমার ॥

তোমার প্রেমে

তুমি যখন আমার উপর আস্থা রাখ ভীষণ অবাক লাগে ,
কারণ আমি ঘাসের থেকে মেরুন রিবন তুলে আনতে গিয়ে
মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়ি ; হাওড়া ব্রিজের নিচের পাগলটাকে
পোষ মানাতে গিয়ে আমি নাগরিকের ভব্যতা খুইয়ে
হ্যারিসন রোডের মধ্যে গুমরে কাঁদি ; আমায় সপ্রতিভ
করে তুমি কেমন ঋজু সঞ্চারিত, কলকাতা আঙিনা,
কিন্তু আমি পরক্ষণে তোমার ঘরের কুলুঙ্গিপ্রদীপও
ভেঙে আবার ফেরার, তুমি কেমন করে খুঁজে পাও, জানি না

এক-এক সময় ভাবি তোমার আনুষ্ঠানিক সম্প্রীতি বুঝি-বা
আমার সঙ্গে , নাহলে এই নিরপেক্ষ সহিষ্ণুতার মানে ?
কিন্তু আবার যখন দেখি মেঝের উপর বিভাবরীর দিবা
জ্বেলে অনাথশিশুর মতো পড়ে আছ, তখন তোমার পানে
তাকিয়ে আমি দারুণ দৃঢ় হয়ে উঠি, তোমায় তুলে ধরি,
ধরতে গিয়ে যখন দেখি বুভুৎসা আর থলথলে লালসা
প্রতিবেশীর মুখে, তখন আবার আমার ভেঙে-পড়ার দশা,
ওরা যখন চৌকি সরায় বজ্র ভেবে মুখ থুবড়ে মরি ॥

পথে

তোমার কাছে যাবার সেতু জ্যোৎস্নায় ভরেছে,
তোমার কাছে আজ আমি যাব না,
প্রবীণ ঈশ্বরের স্মৃতি এ নদীর স্রোতে যে
এঁকে দিল স্বগত আলপনা ।

তোমার কাছে যাবার সেতু আনন্দে ভরেছে ;
কাশফুলের অজস্র মহিমা
পর্জন্যের আস্ফালন অগ্রাহ্য করেছে ;
আমি আমার সীমা

অতিক্রম করেছি, আর তোমার কাছে তবে
কোনোদিন যাব না,
কবন্ধ ঐ ঘরের মধ্যে বিবাহ উৎসবে
স্মৃতির দুর্ভাবনা॥

পথের পথিক

বলেছিলে পথিক হলে মুক্তি পাব।
তোমার প্রস্তাব
অবিশ্বাস করিনি, আমি পথের পথিক আজ।
কিন্তু কোথায় প্রতিশ্রুত মহৎ প্রস্থান?

কারণ আমি বাঁকে-বাঁকে নবীন অভিমানে
প্রভাবিত, ঝুলির ভিতর পালক বেড়ে ওঠে;
দেহলিতে শতচক্ষে মেঘের ঘনঘটা,
কেমন করে এড়িয়ে যাই বসুমতীর মায়া?

পথের শেষে অকৃতার্থ মুমুক্ষা অপার।
সজিনা গাছ, পানের বরজ, গিরিকর্ণী ফুল
পার হয়ে এলাম,
শীতের রাতে সংজ্ঞাহীন তুহিন ফুলদানি
পার হয়ে এলাম,
উপসন্ন রমণীদের অক্ষত কামনা
পার হয়ে এলাম,

এখন কোথায় যাব?

ব্যঙ্গ

১

অমুষ্ণ আবেগে বোনা অজিন আসনে
বসিয়েছিলাম,
তুমি তার উপযুক্ত দাম
দিয়েছ আমাকে, আমি বৈরাগ্য মেনেছি, প্রাণপণে।
উপরন্তু, কৌপীনের নেপথ্যগহনে
স্মরণের অবচ্ছিন্ন কাঁচুলি রাখিনি,
ভুবনডাঙায় আজ নও তুমি নও একাকিনী।

ইন্দ্রিয় আমার আছে, মানি, বস্তুজগতের দেনা
সুতরাং বাড়ে, এখনো মেলেনি অতীন্দ্রিয় চাবি,
তবু মনে প্রশ্ন জাগে, যখন তোমার কথা ভাবি
মাতালের আলিঙ্গনে লজ্জা করে না ?

২

শেষ অপরাহ্ণে যবে আততায়ী অতিথিরে ডেকে
ঘরে নিয়ে দিলাম সুস্বাদু ফল মদ মধু জল
পাখার বাতাস আর আশু দস্যুতার প্রতিফল
অমৃতনিষ্যন্দী দাস্যরস, বুকে কিছুই না রেখে,
জামা খুলে দেখালাম কোন্‌খানে অগাধ কুন্তল
রেখেছিল একজন, কোন্‌খানে অবুঝ আবেগে
পুরোনো ঘা মুছে দিতে পিঙ্গশ্যামা অমূল্য অঞ্চল
পুঁজরক্তে ভরেছিল, বললাম কিছুই না ঢেকে।

বললাম : 'প্রভু, তবে তোমার কবল থেকে তারে
প্রত্যর্পণ কর, তুমি যা বলবে আমি বাক্যহীন
পরিশ্রমে হব আজ্ঞাবাহী সম্পাদক আলাদীন,
জানু পেতে পড়ে রব তোমার গৃহের বহির্দ্বারে,
এমন কি, তাকে দেব।'
শুনে বলে : 'তাকেই জামিন
রেখেছি তোর বদলে, তুই যা, স্বাধীন, দেশোদ্ধারে।'

৩

রথ পার হয়ে গেল গর্হিত নদীটি ; হংসারূঢ়
শিশুর মতন সেই সারথি নির্ব্যূঢ়,
নিশ্চিত, এবং সেই সারথিটি হয়ে গেছে বুড়ো।

তবু ভাবে, রথ গিয়ে আরবার জলে
নামবে পদাধিকারবলে,
দেখবে কুম্ভীর হিংস্র, খল জলপরীর নূপুরও,
রবে না সৈকতে বন্দী বেদনাবিহীন উদূখলে।

অথচ অবাধ্য রথ, ঘোড়াগুলি ঘোটকীর কাছে
গিয়েছে বিশ্রাম নিতে, তরল বিশ্বাসে, আস্তাবলে।

একটি ভুল প্রায়শ্চিত্ত

অনুতাপের সিঁড়িতে শুয়ে আছে
আমার বন্ধু, আরেকটু হলেই
পড়ে যাবে সদর রাস্তায় ;
গর্হিত পাপ বরং লুকোলেই

ভালো লাগতো আমার হৃদয় মনে ;
কিন্তু ছাখো, ঈশ্বরের পা
ধরবে বলে কদর্য হাত মেলে
নিতে চাচ্ছে ঋষির শিরোপা।

আমি যে আর সইতে পারছি না—
জটাজুট সমন্বিত ক্ষোভে
এতদিনের সঞ্চিত দখিনা
ওকি শেষে গঙ্গাজলে ধোবে !

ওকি শেষে বুকের হাড় খুলে
আপন হাতে জ্বালবে নিজের চিতা ;
অসামাজিক একটি রক্ষিতা
কেন ওকে নেয় না চরণমূলে ?

আরোগ্য

'সেরে গেছ ?' ফিরে এসে বলল আমায়। কোমল ব্যবহারে
আমি এত নিষ্ঠুরতা কখনো দেখিনি ;
যেদিন রেখে গিয়েছিল, নৃশংসী ভাবিনি ;
বরং সেদিন অধ্যুষিত জনপদের বাঁকে
স্বরচিত ফুলের কানন প্রবল উচ্ছ্বসিত,
আমার সকল পুরুষবন্ধু আকাশ থেকে নেমে
সেই বাগানের চতুষ্কোণে পাম গাছের সারি,
একটি শিশু মেরুদণ্ডী পাহাড় থেকে নেমে
আমায় সুস্থ হতে দেখে আশ্বস্তের মতো
শিউলিবনে মিলিয়ে গিয়েছিল
আপাত সেই ভয়ংকর বিচ্ছেদের ঘোরে।

তারপরে এই মরদেহের অসুখ দিনে-দিনে
তীব্র থেকে তীব্রতর, আত্মা তা সত্ত্বেও
আরোগ্যে আরোগ্যে শুধু পবিত্র হয়েছে ;
দুশ্চিকিৎস্য দেহের ব্যাধি তথাপি আত্মার
নেপথ্যে নিহিত ছিল, স্বখাতসলিলে
শ্বেত যে-পদ্ম ফুটেছিল তার ভিতরে কীট।

আত্মার ভিতরে দেহ, এই আনন্দে জেগে
আজ আমি যেই রাতের শেষে পুবের বারান্দায়
সূর্যকে হাতড়াতে গেছি, এমন সময় তুমি

পৃষ্ঠপোষক সঙ্গে করে ঘৃণ্য দুঃসাহসে
কাছে এলে, অনুমতির অপেক্ষা না রেখে
বসলে এসে আদর-কাড়ার প্রত্ন প্রকরণে !
অনেকেই তো গা ঘেঁষে যায়, কিন্তু কোনোখানে
আমি এত অশ্লীলতা কখনো দেখিনি,
আমি এত অসৌজন্য কখনো দেখিনি
কুশলপ্রশ্ন করার মধ্যে—সেরেই উঠি যদি
শবরী তোর প্রতিহিংসা জ্বলে উঠবে আরো ?

গন্ধর্ব বিবাহ এক

কে আমায় চেনে বল ? এই বৃক্ষতলে
সিঁদুর পরাতে গিয়ে আমি যদি অকস্মাৎ মারি,
কার সাধ্য যে তোমায় বলবে বিধবা ?
বরং আরো তখন তোমার শাড়িতে রক্তজবা।

কিছু-বা দোয়েল কিছু হেনার মঞ্জরী
তোমায় হয়তো বলবে প্রচ্ছন্ন বিধবা,
তোমার শাড়িতে তবু জ্বলে যেন জ্বলে
খয়েরি হলুদ রক্তজবা।

আমি জনপদে থাকি, দেখি না নিসর্গ, নীলাম্বরও ;
তুমি যাও গ্রীষ্মাবাসে সিমলায় সাজ পুনর্নবা ;
আমার সমক্ষে যদি একবার শাদা থান পর
মহাশূন্যে রেখে যাই নিরঞ্জনের রক্তজবা ॥

উপলক্ষ

পথে অজগর ডবল ডেকার সেই অজুহাতে
তোমাকে ধরবো দু'হাতে।
দম্বিত ব্যতীত কিছুই দেখতে পাওনা দু'চোখে
কাছে টানি সেই সুযোগে।
'দৃশ্যবদল ভীষণ জরুরি, আয় নিসর্গে'—
বলে নিয়ে যাই পার্কে।
বিনা অছিলায় আমার সঙ্গে যে-মেয়ে মিশতো
তার ঠোঁট উচ্ছিষ্ট।
মেঠো হাওয়া—তা-ও এখন ক্বচিৎ সহজলভ্য
পায় শুধু একলব্য,
যে-একলব্য সন্ধানে থাকে, ঈশ্বর ছাড়া
যার বুকে হা-হা সাহারা
ব্যথায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকে, যার উপাস্য
নয় জীবনের পাঁচশো
তরল দেবতা, যার উপাস্য মাত্র একটি
অনধিগম্য ব্যক্তি,
তারি 'পরে নামে মাঠের ঈষৎ বাতাস হঠাৎ
পরক্ষণেই প্রতিবাদ
করে সরে যায় ; তবে তুমি আর প্রভু পরোক্ষ…
ক'মাত্রা পার্থক্য ?
পরোক্ষ প্রভু (ঈশ্বর), তুমি (অনীতা)—কতটা
স্বতন্ত্র দু'টি সত্তা ?
স্বতন্ত্র হলে সে-প্রভু তোমার চেয়েও হাজার
গুণে উপাসনাযোগ্য—
নাকি তুমি এক দারুণ অছিলা বিধাতা পাবার
অলঙ্ঘ্য উপলক্ষ ?

দাসী বলেছিল

দাসী বলেছিল হাঁটুর উপরে সল্‌তে রেখে :
"তারা ঝরে গেল, দিদিমণি, তুমি পথে যেয়ো না,
দিদিমণি, তুমি পথে নামলেই দেখতে পাবে
পুরুষের মতো একটি পুরুষ (এ নয় তাদের
গোষ্ঠিভুক্ত যাদের ঘাড়ের সকল মাথা
ভেঙে দিয়ে তুমি আলতা পরেছ পরক্ষণে ;
এ নয় তাদের দলের একটি মেয়েলি ছেলে
যার বরাদ্দ টিনের পাত্রে আলুনি রুটি) ।
এই পুরুষের আরো দুটি নাম—একটি জীবন,
অন্য নামটি মৃত্যু সেকথা স্মরণে রেখ ;
দাঁড় বেয়ে সবেমাত্র নেমেছে, শিরদাঁড়াতে
ঘাম ঝরে, খাড়া গম্বুজে নামে বৃষ্টিরাশি,
এবং তোমায় আদেশ করবে মুছিয়ে দিতে
সুযোগ দেবে না চিন্তা করতে, কাঁপিয়ে দেবে
ঝোড়ো রাস্তায় ঊনবিংশতি কুন্দকলি ।
তার চেয়ে আয় ঝাঁপির মতন ছোট্ট ঘরে
যে-ঘরে একলা আমি থাকি আর কেউ থাকে না,
নাগমাতা সাজি আমি নিশ্বাস বন্ধ রেখে,
যদি সাধ যায় বরং আমায় ছোবল দিবি—

দিদিমণি, তোর নাকের বেশরে আগুন কেন ?"

অকস্মাৎ

হ্যারিকেন বদল করতে গিয়ে হাতের বিদ্যুতে
ছুঁয়েছিলে আমাকে যখন তুমি, বিবাহমন্ত্রের
থেকে গূঢ়তর সত্য মর্মে এল ; সত্য তাকে বলি
ছলকিয়ে যা জ্ব'লে ওঠে, হঠাৎ-সমুখ ঝর্ণা যেন

পথের বালুতে, সেই-যে দুমকা যেতে গিয়ে অতর্কিতে
বড়ো-বেশি-সনাতন-প্রেমিকেরে ভালোবেসেছিলে,
অবৈধ বুঝি বা, তবু সত্য সেই, চিরন্তনের
অতি পরিচিত ভঙ্গিটির প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের
সুযোগে বিশ্বাস এল। তা না হলে বৈঠকখানার
আমুদে তৃপ্তির মধ্যে রবীন্দ্রসংগীত ইত্যাদির
ঘৃণ্য বিড়ম্বনা, কিংবা জম্বুদ্বীপে ক্লাবের জলসা,
অথবা 'তোমাকে আমি ভালোবাসি' বলার মতোই।
তুমি কি এসব কথা জেনে গেছ, ঈশ্বরী আমার,
আমাকে বাঁচাবে বলে তুমি কি হ্যারিকেনের কাচে
ছড়ালে মুখের ভাপ, কুয়াশা—কুয়াশা অগ্নিময়
আমাকে শিখিয়ে দিল প্রতিটি মন্দির নিয়ে রাখে
প্রলয়শেষের ভস্ম, আমাদের দু'জনের ঘরে
হে অটুট, তুমি বুঝি রেখেছ অযুত গৃহদাহ!

রাত্রির রাজপথ

ট্রামলাইনের রাস্তা সারায় রাঙা লণ্ঠন জ্বেলে
দুটি ঈশ্বর ছেলে;
একটি অধিক ঈশ্বর, তাই হঠাৎ তার হাতুড়ি
রাতের যক্ষপুরী
প্রসঙ্গক্রমে ভাঙতে চেয়েছে, আর অপেক্ষাকৃত
অর্ধেক দীক্ষিত
সঙ্গীটি তাকে বাধা দেয় তাকে বাধা দেয় কৌশলে;
যদি শেষে ট্রাম চলে
দ্বিতীয়োক্তটি প্রথমে উঠবে, তারপরে কোন্‌জন?
রাঙা ঐ লণ্ঠন।
তারপরে? পথ। আর তারপরে? পচে-যাওয়া সব ঘর,
বাকি ঐ ঈশ্বর॥

নতুন মন্দির হবে বলে

নতুন মন্দির হবে বলে
কেউ-বা মোহর দিল, কেউ-বা কাহন ;
যে-শিশু আপন মনে দোলে
সে তার দোলনটুকু দিয়ে দিল, আর একজন
অনিচ্ছুক দিল তার সকল অনিচ্ছা, সে যখন
সকল অনিচ্ছা তার সঁপে দিল, মন্দিরগঠন
তখনই সম্পূর্ণ হল।
মন্দিরের দেবতাবৃন্দেরে
স্তম্ভের উপরে বহে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যক্ষ, যে-দেবায়তন
যক্ষশূন্য আমি তাকে ছেড়ে
চলে যাব এই কথা ভাবছিলাম, কিন্তু যেই চলে
যাচ্ছি দেখি পৃথিবীতে নতুন মন্দির হবে বলে
কেউ-বা মোহর দিল, কেউ-বা কাহন,
যে-শিশু আপন মনে উত্তরের বারান্দায় দোলে
সে তার দোলনটুকু দিয়ে দিল ; আর একজন
দারুণ অনিচ্ছা দিয়ে মন্দির সুদৃঢ় করে তোলে ॥

ঘরনী

আসলে একটা আরশোলা
তার বেশি কিছু না,
তবু একবার বারান্দায়
ভয় পেয়েছিলে তো ?

দেয়ালে একটি গোয়েন্দা
লিপ্ত দেখেছ, আর
বাড়ি ঘর দোর বিক্রয়ের
প্রতিজ্ঞা করেছ ?

উত্তরঙ্গ যুবসমাজ
শিস্ দিয়েছিল, তা
বেশ করেছিল, দোয়েলদের
নকল করেছিল ।

শ্মশানচারীর গলার স্বর
চড়েছিল ক্রমশ,
মনে তবু কেন দয়িতেরে
ছেড়েছিলে বল তো ?

রক্তজবা আচম্‌কা আমাকে

এই শোনো, হাত ছাড়, মা আছেন পাশের ঘরেই,
পূজার ঘরেই,
পূজা করতে ডাকছেন আমাকে ।

ঈশ্বর উপর থেকে দেখতে পাচ্ছেন,
হাত ছাড় ;
সমস্ত নিসর্গ আজ মুখরিত সাজ্জাদ হোসেন,
শানাই বাজিয়ে সব বলে দিচ্ছেন, বিধাতাকে ।

শোনো, হাত ছাড়, প্রেম কোরো না আমাকে ; দূরে বোস,
বুদ্ধদেব বসু
শুনলে যে বলবেন প্রকৃতির দুলাল তোমাকে—
টি টি পড়ে যাবে, ত্রিজগৎ বলবে 'বিগত পরশু !!!'

আহ্নিক অয়ন

বুকের নিশ্বাস বন্ধ যতক্ষণ, ভীষণ ডাকাত
সমস্ত সরাতে থাকে, এক-এক নিশ্বাসে
মানুষ অনেকখানি ম্লান হয়ে আসে, চরাচর
শুকনো দেখায় বড়ো, শিশুর মুখের
বিশুদ্ধতা কমে যায়, ঘুড়ি কেটে গিয়ে
কার্নিশে অনেক দিন পড়ে থাকে, যদি না দিদিমা
কিংবা অনুরূপ কোনো বর্ষীয়সী এসে রুগ্ন ঘুড়ি
আবার সারিয়ে তুলে লোকচক্ষে সাজিয়ে ধরেন ;
আর তুমি, ব্যক্তিগত বিশ্বের কস্তুরী,
তুমিও কি অতর্কিতে খোয়া গেছ, তা না হলে তুমি
আমাকে হঠাৎ দেখে অমন সমীহা ব্যগ্র করে
প্লাস্টিক চিরুনিখানা খোঁপা থেকে ফেলে দিলে কেন ?

দুটো উনুন

এ ঘরে আছে দুটো উনুন, রান্না দাও চড়িয়ে,
অতঃপর ত্বরিতে বনভোজনে
চল আমার সঙ্গে চল ; আমন্ত্রিত অতিথি
নিজেই পরিবেষণ করে সাধ্যমতো ওজনে
আহার করে নেবেন, আর আহারান্তে গড়িয়ে
নিতেও যেন পারেন শুয়ে, শরীর ফেলে ছড়িয়ে
ব্যক্তিগত প্রকৃতি
মেলতে যেন পারেন, তাই শীঘ্র শাড়ি জড়িয়ে
বুলিয়ে নাও চিরুনি, চল, সঙ্গে চল।   অতিথি
কষ্ট যেন না পান, যেন ভদ্রতার পরিধি
রাখতে গিয়ে আপন গৃহে স্বাস্থ্যসুধা ঝরিয়ে

ফিরতে তাঁকে না হয়, তাই এ ব্যবস্থা।   অদিতি,
তবুও তুমি যাবে না?   তবে না জেনে তাঁকে সরিয়ে
আমিই বুঝি তোমার ঘরে আমন্ত্রিত অতিথি?

ত্রয়োদশী

জ্যোৎস্নায় আমার বাবা কোথায় গেলেন?   কার কাছে?
আমের মঞ্জরী বারান্দায়;
ছোটনকে আমগাছটায়
উঠতে বারণ করে তিনি কেন নিজে
হুঁচট খেলেন গন্ধরাজে?

গন্ধরাজ ফুলে কোনো কাঁটা তো ছিল না,
সদর দরজায় ছিল পড়ে,
যেতে গিয়ে আচম্‌কা বাবার ডান পা গেল ছড়ে,
কি জানি বাবার পথে ফাঁড়া আছে কিনা।

ছোটনটা কী যে পাজি, সদর দরজায়
বাবাকে নকল করে, তর্জায় গর্জায়॥

আনন্দের অন্ধকারে

তবে তোমার লাল রিবনে চড়ুই পাখির হাত।
নাহলে নির্ঘাৎ
শিশুর স্পর্শে কাঁপল তোমার নয়নভীরু তুহিন স্তনযুগ;
আমি তোমায় গভীর প্রণিপাত
করতে গিয়ে পা ছুঁয়েছি, এমন সময় হেরি
গগন জুড়ে দিন হয়েছে দিন,

যৌথ নমাজ পড়তে আমায় ডাকেন মুয়াজ্জিন,
এক-আজানের নদীর জলে তোমার এবং ঈশ্বরের মুখ
একই সঙ্গে পাঠ করেছি, মালতী গন্ধেরই
ছায়ায় দেখি সৌর মরাল, যেই আনন্দভেরী
তুলে ধরতে গেছি আমি, পাংশু নিরুৎসুক
মুখ বেঁকিয়ে পালিয়ে গেলে, যেমন সুযোগসন্ধানী শুক

ছেলেটি

টিফিনের পয়সা জমিয়ে
ডোমপাড়ায়
পায়রা কিনতে যায়।
একবার পায়রা কিনতে গিয়ে
অন্তরায়
সারা শরীর ছায়
পায়রাগুলো, কিন্তু সে তবুও
নতুন পায়রা চায়
ডোমপাড়ায়
যাবার পথে যতই তুয়ো তুয়ো
রাস্তা খুলে যায়
পায়রাগুলোর ক্ষুব্ধ তম্বুরায়

বল আমার প্রার্থনায় কোথায় ভুল ছিল ?

হাঁটতে-হাঁটতে প্রার্থনা করছিলাম আমি
নতজানু হব যে তার সময় পাইনি,
তাই কি তুমি অমন ভীষণ বজ্র হয়ে
হানলে আমায়? সান্ত্বনাদায়িনী

আমার ঈষৎ দূরে ছিল, প্রার্থনা শেষ হলে
বুকের কাছে কোলে
তাকে নিয়ে আদর করার কথা ছিল ;
কিন্তু আমি নতজানু হইনি বলে
ধ্যানধারণার চেয়ে অনেক দামি
ধাত্রয়িত্রী···তুমি তাকে নেভালে এক ফুঁয়ে ;
কী নিয়ে আমি থাকব তবে ?   হিরণ্য কলুয়ে
দেহাবশেষ দারুণ দীপ্তি দেখতে পাব ভেবে
হত্যাভূমির কাছে গিয়ে আমার ভুবন আবার উঠল কেঁপে,
মৃতদেহের ভূমণ্ডলও গ্রাস করেছ অ্যাসিড দিয়ে জলে !

বিরোধাভাস

তুমি আমায় বলে দিয়ো না
কী করে তোমার গান গাইতে হবে আমাকে ;
আমি হঠাৎ কখন দু'মাত্রা গলা তুলে
সবার সমক্ষে তোমাকে নাজেহাল করে দেব
কখন আমি নিচু খাদে গলা নামিয়ে
তোমাকে অঝোরে কাঁদাব,
তুমি আমাকে শিখিয়ে দিয়ো না।

যাঁরা তোমারই কথায় তোমাকে গান শুনিয়েছিলেন
এক-একবার তাঁদের মনস্বী স্তাবক বলে সন্দেহ হয়,
জগদ্বরেণ্য সেই সব স্তাবক মনস্বীদের
মৃত সমাহিত মহতী জনসভা থেকে
আমি পালিয়ে গিয়ে তোমার মুকুটে পালক গুঁজে দেব,
কখন পালিয়ে যেতে হবে
তুমি আমায় শিখিয়ে দিয়ো না॥

প্রভু আমার

আমি তোমার বড়ো সাধের ? বুকের হৃদয় নাকি
সে তো তুমিই জান ;
প্রভু তুমি শিকার কর থিরথিরে জোনাকি ?
জানেন গুরু নানক ?
বালিকাদের নিতম্ব, না কুমারিকার গাঢ়
অন্তরীপে তুমি ?
আমরা খুঁজি পাড়ায়-পাড়ায়, বিপ্রতীপে রহ
কিংবা অনুভূমিক !
একটি বালক বলেছিল তোমার খবর রাখে,
কিন্তু প্রমাণ দিতে
পারেনি তাই আমার দলের সবাই মিলে তাকে
শীতার্ত রাত্রিতে ....
চরমপন্থী না হলে কি তোমায় যাবে পাওয়া ?
সে তো তুমিই জান,
সবার নিকট কথার খেলাপ করে নিবিড় ভাবে
সজোরে গর্জানো,
আসন্নশেষ বৃদ্ধজনের দায়িত্ব না নিয়ে
তোমাতে ছল্‌কানো
ভুল, না ভালো ? কেঁপে ওঠে তোমার বিশাল গৃহে
আমার নগ্ন আনন !
যতক্ষণ না তোমার মুখের পাশে আমার মুখ
এক মুখোশের তলে
রাখতে পারি, গ্রহ ঝিনুক সূর্য চন্দ্র মানুষ
ছড়াই খেলাচ্ছলে !

পান্থ

মাঝে-মাঝে স্পষ্ট করে বলা দরকার
ঈশ্বর আছেন,
মগডালে-বসে-থাকা পাপিয়াকে আর
পর্যবসিত বস্তুপৃথিবীকে স্নান করাচ্ছেন।

মাঝে-মাঝে স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন
তুমি যে আমার
সাধনার ধন,
তুমি চলে গেছ বলে আমাকে গাহন করাবার
কেউ নেই, যত্রতত্র সেরে নিই মধ্যাহ্নভোজন।

কার পায়ে?

অচেনা শিশুর ঠোঁটে, গুর্জরী নারীর কর্ণমূলে,
রাস্তার মানুষদের পদ্ধতির ভুলে
আমার বুকের আত্মা ছড়িয়ে রয়েছে;
ঘুমন্ত নারীর ওষ্ঠে, শিশুর শিরীষ কর্ণমূলে,
পথচারীদের ভ্রান্ত ভীষণ সংকুলে
আমার ছড়ানো আত্মা। আমি ন্যুব্জ সেজে
ভিক্ষা চাই, আমি তীব্র মমতার তেজে
যুবকের হাতের ফাটলখানি ভরে দিই যেচে;
আমার কান্নার ঢোল নিয়ে সব সুন্দরী হয়েছে;
এই মনে করে যেই পথে নামি, আমার আত্মার
অজস্র-খচিত এক ত্রিভুবন দুলে ওঠে, আর
কাণ্ডজ্ঞানশূন্য এক বালকের ছেড়ে-দেওয়া পিঁপড়েরা আমার
অযত্নে ছড়ানো আত্মা কার পায়ে জড়ো করে আনে!

এক চিল্‌তে রোদ

আমায় তাকিয়ে থাকতে দাও
এক চিল্‌তে রোদের দিকে :
আমি বুঝতে পারব
তোমরা কে কী করছ :
আমি বুঝতে পারব কে কে
আমার রক্ত থেকে আবির মেখে
নিজেদের নামে চালিয়ে দিচ্ছ।
আমায় তাকিয়ে থাকতে দাও
এক চিল্‌তে রোদের স্বল্প আয়োজনের দিকে :
আমি বুঝতে পারব
কোন শিশুটি চিবুকের দিঘিতে ডুব দিয়ে
পান্‌কৌড়ি ধরছে :
কোন দম্পতি পরস্পরের মধ্যে একজনকে
অনবরত এড়িয়ে গিয়ে
বিকৃত চটুল অমৃতত্ব কিনে নিচ্ছে ;
কিংবা অন্ধকার গর্তে
অনুপস্থিত বন্ধুকে টেনে নামাবে বলে
যারা থল্‌থলে আহ্লাদে এ ওকে আল্‌ঠাচ্ছে।
যাদের ভেবেছিলাম আর্দ্র চন্দনের মমতায়
সূর্যের মতন ধ্রুব
রথের চাকা ডেবে গেলেও চিরায়ত কর্ণের মতো
কবচ কুণ্ডলে ট্র্যাজিক ঋজু
তারা প্রত্যেকেই সামান্য ঘুষের বদলে
আত্মা বিকিয়ে দিল
বলতে আমার লজ্জা করছে
ওদের প্রত্যেকেই
নিজ-নিজ পৃথিবীর অনমনীয় বাসুকিফণা
প্রত্যাহার করে নিয়ে পিছন থেকে গোড়ালি চেটে দিচ্ছে ;

ওরা ভেবেছে
আমি ওদের দেখতে পাব না,
ওরা ভুল ভেবেছে—
আমার সারল্য চাতুর্যের পরিপন্থী মোটেই নয়,
আমার উপেক্ষা দেখতে না-পাওয়ার সমার্থক নয়।

অভিজ্ঞতা তোমাদের ক্ষতবিক্ষত করে
আমায় কেন্দ্রগ শীর্ণতায় ডেকে নিয়ে আসে ;
তোমাদের মতো আমারও
আয়ুর আপেল অনিবার্য বাদুড়ের উপজীব্য ;
কিন্তু তোমরা কেউ রাতারাতি
জীবনকে সারমর্মের রুদ্রাক্ষে পরিণত করলে ;
কেউ-বা আক্রোশে রোদ্দুর অরণ্য সাম্রাজ্য মহাদেশ
আঁকড়ে ধরলে, যদি পুষিয়ে নেওয়া যায়
নশ্বর মানবনিয়তির ক্ষতি ;
আর আমি, কুমোর যেভাবে একতাল মাটি থেকে
পৌঁছয় এতটুকু নিদ্রাকলসের নাটকীয়তায়,
সেইমতো আজ আদলসর্বস্ব এক চিলতে রোদের প্রশস্ত বারান্দায়
দাঁড়িয়ে সব-কিছু দেখতে পাচ্ছি,
দোহাই, বড় বড় নামজাদা রৌদ্রের সামাজিক শ্যাওলায়
তোমরা আমার পায়ের শিকড় জড়িয়ে দিয়ো না ॥

অভ্রবহ্নি

নক্ষত্রেরা একরাতে পালিয়ে যাবে না ;
অথবা নিহিত সূর্য ; তবে কেন বোকার মতন
গহ্বরে চলেছ তুমি ? গহ্বরে কি প্রিয়তমা আছে ?
অন্তর্হিত মূল্যবোধ, অস্তমিত ঈশ্বর, পূষণ,
গহ্বরে এসব আছে ?

উঠে এসে ছাখো,
চন্দ্র জ্বালে ব্যক্তিগত অভ্রবহ্নি, ততটুকু ছাড়া
কে কাকে আগের মতো ধার দেবে মঙ্গলকলস ?
নিজে তুমি অনলস পাহারা না দিলে ধরিত্রীর
যেটুকু বালিকা-অংশ বাকি আছে, অপহৃত হবে ;
নিজে তুমি অনলস পাহারা না দিলে দরিদ্রের
যেটুকু পুরুষ-অংশ বাকি আছে, অপহৃত হবে ।
সারা পৃথিবীর শিশু বিকলাঙ্গ করে দিল যারা
তোমাকে মেধাবী তেজে তীব্র অভিশাপ দিতে হবে

ঈষৎ-শিশুটি

মহিষের পিঠে চড়ে ঈষৎ-শিশুটি
ঝুঁটি নেড়ে আকাশকে বকে দিয়েছিল ;
সন্থ-সিমেণ্টের মতো মহিষ বাছুরসম আরো
নম্র, আরো নম্র হল ; কিন্তু উঁচকপালে আকাশ
ক্রেন নামিয়ে তুলে নিল একটার পর একটা গাছ,
একটির পর একটি ফুলের মতন শিশু, নারী,
হাটের খদ্দের থেকে ফস্‌কে-যাওয়া লাল মুরগী, ভেড়া,
সবুজ শিমের মতো শিঙা-হাতে রঙ্গন বালক,
প্রায়-সবই তুলে নিল পৃথিবীর, যা-কিছু নিল না
শুঁকে-শুঁকে ফেলে দিল যা-কিছু সে নিল
নিজের গহ্বরে, দিল নিজেকে বাহবা, শেষবার
মহিষের পিঠ থেকে ছিন্ন করে নিল যবে তাকে
ঈষৎ-শিশুটি খুব খিলিখিলি বকে দিয়েছিল ॥

অ্যাকুয়েরিয়ামে

তুমি বুঝি ভেবেছিলে অ্যাকুয়েরিয়ামে মৃত্যু নেই ?
ঈর্ষা ঘৃণা মাৎসর্য এসব কিছুই সেইখানে
বিন্দুমাত্র নেই, শুধু সহজাত ভদ্রতা রয়েছে ?
তুমি বুঝি ভেবেছিলে সুনির্বাচিত মীনরাশি
হীনমন্য হতে খুব অসমর্থ ? গৃধ্নুতা অথবা
পরকাতরতা বলে শব্দ নেই তাদের সংসদ্-
অভিধানে ? দুধের শিশুর মতো ওদের কামড় ?
তবে সত্য কথা বলি (এক-এক সময়ে সত্য কথা
অত্যন্ত অপরিহার্য) অ্যাকুয়েরিয়ামে মাছগুলি
ভয়ানক নীচ আর স্বার্থপর, ছিন্নমূল কিছু
ধনাঢ্য উদ্বাস্তু যথা কলকাতার প্রান্তিক পল্লীতে
মন্থণ বসতি করে, সেই মতো শহুরে গ্রামীণ
মাছগুলি কাঁচঘরে এ ওকে চুম্বন দিতে গিয়ে
বিষাক্ত দংশন করে, যখন জৃম্ভন তোলে, ভাবি,
—আমরা মানুষ যত—সুন্দরের কাছাকাছি এসে
স্নিগ্ধ ধিক্কার করছে পৃথিবীকে, কিন্তু ততক্ষণে
মৎস্যকুল মাৎস্যন্যায়ে গুছিয়ে নিয়েছে নিজ-নিজ
মোটা মাইনে, স্ত্রীর জন্য নগ্ন শাড়ি, শালীর জন্য
দ্ব্যর্থক বুকের জামা। এখানে একথা বলা ভালো,
স্ত্রীরা খুব সন্নিকটে থাকা সত্ত্বেও মৎস্যকুল
প্রধানত সহগামী, শ্যাওলা সরাতে গিয়ে তাই
শ্যাওলায় জড়িয়ে পড়ে মাছগুলি ; ভার্যার সমীপে
ভাষ্য দিতে গিয়ে বলে "মরার সময়টুকু নেই,
এটাই ট্র্যাজেডি দ্যাখ, তাছাড়া দু'বেলা শ্যাওলা-সাফ
শরীরে পোষায় নাকি ? কিন্তু কর্ম সে-ই তো জীবন
পুরুষের" এর উত্তরে মহিলা-মাছেরা নথ নেড়ে
যদিও-বা কিছু বলে, বুদ্বুদের কোলাহলে সবই
চাপা পড়ে যায়······সব তিরস্কার খিলিখিলি হয়ে

অনুমোদনের মতো বেজে ওঠে।   তখন সোৎসাহে
পুরুষেরা চলে যায় পুরুষের দিকে ; এইভাবে
পুরুষানুক্রমে কিছু ব্যভিচার অগভীর জলে
রয়ে যায় ; মৃত্যু জমে, জমে ওঠে, মৃত্যু সত্ত্বেও
কয়েকটি সুদৃশ্য আছে মাছঘরে, মাছের কঙ্কাল
চৈত্রের পাতার মতো উপশিরাবহুল গহনে
শুয়ে থাকে, এবং তখনই মাছ মৃত্যুর মাধ্যমে
শুদ্ধ হয়ে ওঠে আর বৎসর-বৎসর চলে গেলে—
স্তরপরম্পরা ঠেলে মানুষের রাজ্যে উঠে এসে
পুরুষের ডানহাত হয়ে যায়, পুরুষের হাতে
বিশেষত পুরুষের বোধিবিদ্ধ হাতের পাতায়
সভ্যতার সব পাপ শুদ্ধ মানচিত্র হয়ে আছে ॥

পেলব আততায়ী

তৃণ, আমায় অমন করে অবজ্ঞা কোরো না—
(তুমি নিজেই একদা খুব অবজ্ঞাত ছিলে !)
কালকে যখন সারাটা রাত ঘরের বাইরে আমি
পথ হারিয়ে ঘুরেছিলাম তখন তোমার হাতে
নির্যাতিত নিগৃহীত হয়েছিলাম আরো,
আপাত ঐ নরম দাঁতে আমার প্রেমিক দেহ
টুকরো-টুকরো করে তুমি রোমশ ক্ষিপ্র হাতে
সভ্যতা খুইয়ে মাঠে নগ্ন ফিরেছিলে
রক্তের স্বাদ উদ্‌যাপনে, এমন ভীষণ ক্ষণে

ক্ষৌম সরলতার গাঁয়ের অগম-ওপার থেকে
কারুকাজের পিতল ঘটি বোকার মতো বয়ে
ফিরতেছিল দুলালী এক, শিকার করতে গিয়ে
নিজেই শিকার হয়েছে সে···আমায় দয়া করে
বলে উঠল, 'আমি তোমার বহিন্, ঘন রাতে

প্রতিপদের চন্দ্রকলায় নম্র অসঙ্কোচে
আমি তোমার দেহের কাছে বহিন্ হতে পারি।'

তৃণ, তুমি সেই নারীকেও অবজ্ঞা করেছ,
অথবা সন্দেহ। তুমি নিজে নারীর মতো
সেবা করবে ভেবেছিলাম, কিন্তু নারীর মতো
তুমি আমার অর্জিত সেই পথের ভগিনীকে
টুকরো-টুকরো ছিঁড়ে-ছিঁড়ে পুরুষদের হাতে
এক-এক টুকরো দিলে যখন, তখন থেকে আমি
নারীর বুকের দুটি সত্তা বুঝতে পেরে গেছি॥

ভ্রান্তিমুকুরের দয়া

ধনুকের বাঁকানো পিঠের মতো মাঠ ভেঙে দিবা অবসানে
আমি একটা পাথরে বসেছিলাম। সূর্য অস্তের কুজ্ঝটিতে
কারে হেরি' প্রথমে ভেবেছি বুঝি আমার জননী,
সেই মতো আকাশদুহিতা এক হৈমন্তী মহিমা,
কিন্তু পরক্ষণে দেখি তুমি, তুমি—সিঁথিতে রক্তাভ অভ্র জ্বলে
গৌহাটির বিহু-পরবের মধ্যে কেন্দ্রগ আননে উৎসারিত
নিখিল ভরসা, শস্য যেন ফুল, ঝর্ণা জনপদে;
কিন্তু না, আরেক জন, তবে কি পুরোনো সেই দাগী,
দেখেছি ভয়ের রাত্রে যাকে সেই বরানগরের বক্রপথে
যত হেঁটে আসে যেন মহাপাতকীর মতো মুখ,
প্রতিশ্রুতিহীন, মারে বিনাদোষে শিশুদের, ছেঁড়ে
বুকের পালকগুলি, একান্ত অপ্রণোদিত; যেই
আরো কাছে এল দেখি আমারি চোখের ভুল, দেখি
কেউ না কেউ না এক অত্যন্ত অজ্ঞাত নবাগত,
ঘৃণাশূন্য প্রেমশূন্য চোখে সে আমাকে চেয়ে দ্যাখে,
কিন্তু ততক্ষণে শুধু শুক্লপক্ষ বুকের নিভৃতে, নীলিমায়,
ভ্রান্তিমুকুরের দয়া: যেন সারা জগৎ আমার

গোধূলির কনকনথদর্পণে দেখা হয়ে গেছে,
মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে
সেই মতো দিবা অবসান জুড়ে দারুণ ভুলের
মমতায় জাগে শুধু প্রকাণ্ড প্রান্তরে একজন

আসন্ন

প্লাবিত জ্যোৎস্নায় ও কে মাউথ-অর্গ্যান
বাজায় প্রকাশ্য রাজপথে ?
লঘু সুরে কাকে অর্ঘ্যদান
করবে অদূরভবিষ্যতে ?

জানালায়-জানালায় রুদ্ধশ্বাস উৎকণ্ঠায়
মেয়েরা দাঁড়িয়ে শোনে সুর ;
যেমন আঙুলে ওর অর্ধভাগ, বাকি কাজ ওষ্ঠাগ্রে ঘনায়,
তেমনি দু'দিকে দুই ফুটপাত,
যথাক্রমে জীবনের এবং মৃত্যুর

যে-কোনো মুহূর্ত ওকে দুই বিকল্পের একদিকে
নিয়ে যাবে, তিনকোণা পার্কের বৃক্ষের নাগালে
নিকটস্থ বাড়িটার পর্দা-টানা জানলার আড়ালে
একা এক সপ্তদশী সেই লঘু সুরের শক্তিকে

এখনো উপেক্ষা করছে ; শ্রবণের গর্ভে তিলে-তিলে
অবৈধ শিশুর মতো সে-সুরের স্বরলিপি বাড়ে,
ফাটলে-ফাটলে জল—তবু ভাবে অকূলপাথারে
গুরুজন বাতিঘর, মরবে না স্বখাতসলিলে ॥

অ-সনাক্ত অজস্র মানুষ

এ যেন সবার ভালোবাসা
বরণডালার মতো বুকে এসে আকুল কাঁদায়,
অনুমতি কর, আমি ঈশ্বরের নাম গেয়ে উঠি ;
তুমি একা ওরকম একমাত্রতায়
ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা চেয়ো না,
তুমি বৃক্ষতলে এই আত্মমগ্ন সুখের সরসী
সর্বময়ী নদী বলে ধারণা কোরো না ;
আজ সন্ধ্যাবেলা সব ভালোবাসা আমার হৃদয়ে
বরণডালায় এসে একত্র হয়েছে কোনোক্রমে,
তুমি যদি দ্বিতীয় জনের মতো অন্য কথা বল,
তুমি যদি যুক্তিবাদী রমণীর মতো তর্ক কর
তাহলে বরণডালা ভেঙে যাবে অপ্রস্তুত লাঞ্ছনার ভারে।

ভাগ্যে আজ সারাদিন যূথজনতার কাছে
পথে-পথে উপেক্ষা পেয়েছি,
সজিনা গাছের পাশে উপবিষ্ট বাস্তুহীন ভিক্ষুকের কাছে
ভাগ্যে আজ ভৎর্সনা পেয়েছি—
যত অপমান যত অবজ্ঞা সকলি, প্রিয়তমা,
যদি সন্ধ্যাবেলা তোর তরল মুকুরে
ঠেকে গিয়ে ভেঙে যেত, কী যে হত ভাবতে পারি না ;
তা না হয়ে এই ভালো, রূপান্তরে সবি
দু'তিন আকাশ ধরে চলে এল বুকের সন্তুষ্ট মহাকাশে—
দেখেছি যে সব বৃক্ষ তাদেরও ওদিকে বৃক্ষ ছিল,
যা আজ দেখেছি সে তো খণ্ড ছিন্ন ব্যক্তির বিকৃতি,
যা দেখেছি গতকাল, কিংবা তারও আগে (মনে কর
গালুডি স্টেশনে সেই অ-সনাক্ত অসংখ্য মানুষ
মাঙ্গলিক ভূমিকায় নিজেরাই সে কথা জানে না,
অথচ সূর্যাস্ত লেগে আমাদের উভয়ের প্রেমে
কী রকম শক্তিশালী উপলক্ষ !) যা দেখেছি শুধু

ধ্যানধারণায় কবে জ্রূণভবিষ্যের মতো অস্পষ্ট অথচ নির্ধারিত
আজ সেই ভবিষ্যৎ এসেছে কি ?   হয়ত এসেছে,
আজ আর ঘটনায় অতীত ভবিষ্য বর্তমান
পরিমেয় নয়, আজ ধ্যানধারণার পরিশ্রম
একমাত্র অধীশ্বর মানুষের, প্রেমিকেরও (প্রেমে
ঘটনা কোথায় আজ)।   শুভ বিবাহের লগ্ন এই
সজিনা গাছের পাশে ধারণার বিপ্লবী প্রদোষে—

তুমি আমি নির্বাসিত, তোমার আমার কেউ নেই,
পথে চলে যেতে-যেতে অনুষ্ঠিত মুহূর্তে বিবাহ,
পথে-পথে আমাদের অ-সনাক্ত অজস্র অতিথি !

তুমি কি চেয়েছ শুধু নম্র নবনীত ?

ঈশ্বরের সঙ্গে এক বিছানায় শুলে
অনাচারী নাম যদি রটে তো রটুক ;
যার পদতলে বাঁচি তার বাহুমূলে
কদম্বপরাগগন্ধ ; যে আমার বুক
ভেঙে দিয়ে চলে গেছে তার সঙ্গে যদি
তোমার তুলনা করি, কিংবা যদি তার
গভীর চুলের কাঁটা তোমার হাতে দি'
তবে তুমি ক্ষুন্ন হবে ?   ভীষণ মিথ্যার
মূকাভিনয়ের চেয়ে সত্য স্বাভাবিক,
তবে কেন চাও তুমি নম্র নবনীত ?
তুমি কেন বুঝবে না স্নাতক ঋত্বিক
আগুন জেনেছে তাই এত কমনীয় ;
তুমি কেন পালকের লোভে সামগ্রিক
পাখিটি হাতের কাছে পেয়েও বিমূঢ়া
ছেড়ে দিতে চাও (করে যেমন শিশুরা)
নারী বলেই কি এত নির্বুদ্ধিতা ঠিক ?

প্রচলিত শ্বেতপদ্মে আমার কৃত্রিম
ভক্তি পাবে, এ শুধুই তোমার দুরাশা,
আমি তো বিপথগামী কবিতার ভাষা
গুঁজে দেব খুব সাধ্বী রমণীর চুলে ;
আর দয়া করে তুমি কোরো না তামাশা
দৈবাৎ হঠাৎ আমি ঈশ্বরকে ছুঁলে ॥

ওরা

আমি তোমায় স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম। ওরা প্রথম বিশ্বাস করেনি।
ওরা তোমায় একবাক্যে খুব-অসতী প্রতিপন্ন করে
স্থূলভাবে সমবেদনা জানাচ্ছিল আমাকে। একজন
আমায় সবার কাঁধের উপর চড়িয়ে দিল ; রানার্স-আপে জিতে,
যেমন অধিনায়কেরে ধাঁ করে নেয়—কাৎরে উঠে আমি
যতই কেন নিষ্কৃতি চাই ততই সবাই পালাসংকীর্তনে
আমার জয়ধ্বনি করে। এমন সময় হঠাৎ চেয়ে দেখি
তুমি, আমার মাত্র-তুমি, তুমি, আমার শতজন্মের তুমি
কান্তিভরম জড়িয়ে নিয়ে বিশালপথের প্রকাণ্ড চত্বরে
দাঁড়িয়ে আছ, দীনবন্ধু, ঝিনুকসম দর্পিত বিনয়ে!
প্রকাশ্যে দাতব্য কোনো চিকিৎসালয় না খুলে স্বর্গের
ওষধি সব তিনজগতে বিলিয়ে দিলে, স্বচক্ষে দেখেছি ;
আমার দেওয়া কান্তিভরম! একাকিত্বে বিকচ পদ্মের
বলক্ষ তনুতে শোভে রাগরাগিণীপল্লবিত শাড়ি ;
এবং সকল কবচ খুলে একটি কানে কুণ্ডল রেখেছ,
আরেক কানে পরতে যাবে এমন সময় তিনের বি-বাসের
দশ-বারোটি ছেলে-ছোকরা থুতু ফেলল তোমার মুখে, তুমি
পথের পাশের জলের কলে মুছতে গেলে, কলের নিচে পয়োষ্ণী নগ্নিকা
তোমায় দেখে সাত-আট ঘোমটা টেনে আবার নিষ্ঠীবন করে—
কিন্তু তুমি আমার মতো অনুভূতির শিখণ্ডী রাখনি

হাজার-হাজার জনতা, আর তুমি আমায় শিখণ্ডী রাখনি,
এবং তুমি যেহেতু আর আমায় নিছক আনন্দে রাখনি
সেই সুযোগে—যারা তোমার ভৃত্য হবার যোগ্য তারাই আজ
আমার দেহরক্ষী সখা—ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল তোমার উপর
হাজার-হাজার জনতা, আর তুমি তখন তাদের সবার কাছে
স্পষ্ট, আমি তোমায় যত স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম, ওরা
আরও স্পষ্ট দেখেছিল, চোখ-ধাঁধানো সেই স্পষ্টতার
কুজ্ঝটিকায় ওরা ক্রমেই অন্ধ হল, শেষে সূর্যকেই
তুমি ভেবে বিঁধতে থাকে নর্দমার মাছ-ধরা বল্লমে!

সত্য

মাকে বলতে সঙ্কোচ নেই, দিন ফুরোলে আমি
তোমার কাছে গিয়েছিলাম, তোমার পায়ে মুখ
রেখে অগাধ শান্তি পেয়েছিলাম।
ভ্রূকুটিহীন সন্ধ্যাতারা উঠল যখন,
নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে অর্পিত দেহের
দায়িত্ব যে নিয়েছিলাম, সে সব কথা মাকে
বলতে-বলতে পাগল হয়ে যাব॥

নগরপ্রশ্ন ও সাঁওতালি প্রত্যুত্তর

'ইচ্ছা মিটে যাওয়ার পরেও ঘৃণিত শয়তান
কেন অমন ইচ্ছা বানায়, উত্তাল মশারি
ছিঁড়ে কেন পালিয়ে যায় সকল নরনারী?
দীপির্ দাং দীপির্ দাং দীপির্ দীপির্ দাং॥

"একাদশী চাঁদের চোখে কৃপাদৃষ্টি ঝরে,
কোনো-কোনো গৃহীর মুখে ঈশ্বর ঝরান

কী-অপরূপ আভা, তবু কে রয় নিজের ঘরে ?"
দীপির্ দাং দীপির্ দাং দীপির্ দীপির্ দাং ॥

"রুক্ষ দুপুর সে-ও কি তোদের সুন্দর কাকিমা
এক-একজনের স্বপ্ন নাকি ধানকেয়ারির সীমা ?
মৃত্যু বুঝি তোদের কাছে নিশীথিনীর নাম ?"
দীপির্ দাং দীপির্ দাং দীপির্ দীপির্ দাং ॥

সময়

ঘড়িতে সূর্যাস্ত ধরে গেল,
জন্মদিনে দিয়েছিলে ঘড়ি,
সময়ের আঁচ থেকে দিদিমার ব্যক্তিক দেরাজে
তুলে রেখে বাঁচাতে চেয়েছি ;
তারপর কোথাকার কে এক শ্রীহরি
প্রশ্ন করে বসে যেই, "দাদাবাবু, তোমার ঘড়িতে ক'টা বাজে ?"
"দাঁড়াও দেখছি" বলে তরী বেয়ে দিদিমার কাছে
যেতে গিয়ে সবুর সয় না, শেষে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি
কূলের কিনারে এসে—দিদিমা যেখানে—আর ততক্ষণে খুব
সময় চলে গিয়েছে, যে আমাকে প্রশ্ন করেছিল
সে-ও তার উদ্বেগের সকল কৌস্তভ
নিয়ে চলে গেছে, দেখি চতুর্দিকে সময়ের স্তূপ,
ব্যক্ত-অব্যক্তের মধ্যে ঘড়িতে অস্তাগ্নি ধরে গেল ॥

একটি শিশুর জন্য

এই জানালা থেকে আমি তোমার জননীকে
উদয়সূর্য দেখিয়েছিলাম চৈত্র নবারুণে,
সে আমাকে জানলা খোলার বিরুদ্ধে যে সব
যুক্তি দিয়েছিল তুমি চমকে উঠবে শুনে।

এই একই জানালা থেকে তাকে বিদায় দিয়ে
আমি সুনির্মিত
দুর্গ গড়েছিলাম আমার তরুণ হৃদ্‌ভূভাগে
ভগবানের মতো।

এই একই জানালা থেকে তুমি আমার পাশে
দেখছ আমার মূর্ত স্মৃতির খনি,
ভগবান জানি না, কাকে প্রেম বলে জানি না,
মানব তুমি যা বলবে, মা-মণি ॥

এক-একজন

"বল রাজি ?"
অলজ্জ একটি আধুলি তুলে শূন্যে ঝুলিয়ে লুকিয়ে নিলাম
কাঠবেড়ালিটাকে তা সত্ত্বেও পোষ মানানো গেল না।

ঘর-গরজী কাঙাল, পর-ভালানি ফকির,
হাড়-জ্বালানো ফাজিল, বুক-জুড়ানো ময়ূর—
একে-একে সবই তার পায়ের কাছে রাখলাম,
কোথায় পা, কোথায় কী—কাঠবেড়ালিটাকে ধরাই গেল না।

"নারীর বুকের জ্বলন্ত জ্যোতির্ময়তায় তোকে রাখব,
সপ্তদশীরা তোর সুপ্তিসুখের জন্য সমস্ত খোয়াবে,
ঈশ্বরের এক-একর জমির উপর
মেয়েদের নিয়ে তুই খেলা করবি
কোনো শুল্ক তোকে দিতে হবে না, কোনো জরিমানা"—
নিটিরপিটির কাঠবেড়ালিটাকে তবু কিছুতেই কিনতে পারা গেল না॥

বিজয়া

যে-মুহূর্তে আমি তোমায় সন্দেহ করতে শিখছিলাম,
তোমার গ্রীবার নৌকোখানি তোমার চোখের গঞ্জশহরগুলি
বঙ্গসংস্কৃতির মতো বেদনভরা আজিকে তাকাল ;

ঝড়বাদল-শ্রাবণরাত্রে সনির্বন্ধ তীব্র অনুরোধে
আমায় তুমি বলে উঠলে "ভালো থেক"—বলেই কেমন করে
নিজের মূর্তি ডুবিয়ে দিলে। দারুণ মহান সেই গোধূলি থেকে
বসুন্ধরায় তোমার মতো আর কাউকেই বিশ্বাস করি না।

প্রার্থনা

তোমার বেদীতে আমি বৃথাই চন্দন অর্পিলাম,
কিছু তো হল না। ভাখো, বৃত্ত হতে পারেনি ধনুক,
সেই তো বৃত্তাংশ, নিজ বলয়ার্ধে ধনুকের ছিলা,
কিছু তো হল না। সেই এক মৃত্যু যাপিছে মানুষ।
তুমিও কি ভেবেছিলে আয়ুরক্ষা ভারসাম্য বলে
কখনো কথিত হবে? অথচ পৌরুষ কালক্রমে
নগ্নায়নে পর্যবসিত, আর যথার্থ পুরুষ
কী রকম সংখ্যালঘু, এমন কি, নেই বললেই
ঠিক বলা হয়। নারী সম্মানিত ছিল মধ্যযুগে,
এখন অনুশীলিত মূল্যবোধ। নারী ও পুরুষ
ক্লিষ্ট রূপকের মতো অথবা আসক্ত অনুপ্রাসে
কেমন চলেছে! তবু আবার, অন্তিম দুঃসাহসে
তোমার বেদীতে আমি রক্তচন্দন অর্পিলাম ॥

তীর্থযাত্রী

মা আমাকে নিয়ে একদিন, হাত ধরে,
গিরিবর্ত্মের মতো এই বাঁক পার করে দিয়েছিল ;
ক্ষুধার্ত পথ, পথের দুরূহ প্রান্ত ;
কাঁকন-খোয়ানো কালো এই গলি, দস্যুঅধ্যুষিত
ফাটল-স্ফারিত প্রকাণ্ড ময়দান
হাত ধরে পার করেছিল একদিন।

যাকে আমি আজ হাত ধরে-ধরে এ পথ করব পার,
মা আজ আমার শিশু,
সতর্ক হাতে ঢাকি দুয়েকটি রুপালি চুলের গুচ্ছি,
আপাতত এই ক্ষুধিত পথের ক্ষুরধার চক্রান্ত
কামক্রোধমোহমোহান্তব্যবসায়ী
পার হয়ে যাই, মা কিছু জানে না, মা আজ আমার শিশু ।।

ক্লান্তি

বরবটির খেত ঘুরে রামনাথ বিশ্বাস রোদ্দুর ।
তুমি খুশি হও, তুমি অভিযোগ কোরো না,
বোলো না 'অভাব' বল 'বাড়ন্ত সকলি,
বরবটির খেত ঘুরে পর্যটন করছে রোদ্দুর ।

আঙুল হেলিয়ে দোলে বরবটির সার
জননী পৃথিবী সুখী, তিনি রাজমাতা,
রত্নগর্ভা ; আপাতত আর-কোনো শস্য নেই তাঁর,
আর-কোনো চাষী নেই । মনোনয়নের শস্য নেই ।

তাবলে কী এসে যায় ? কচি-কচি বরবটির মুখে
বাতাস লেগেছে, আর রোদ্দুরের তেজে
বেড়ে উঠে তারা হেসে কুটি-কুটি নেচে-নেচে সারা ,
এবার মরতে তিনি রাজি । নৌকো খুলে দাও, মাঝি ।।

২

আমি তো আগেই যত সন্তাপ এনেছি রূপান্তরে
শরদচন্দ্রসন্নিভ সরোবরে ।

আমি কি দুখেরে ডরাই ? আমি তো প্রস্তুত হয়ে আসি,
রাখি কুবলয় কোকনদে বুক, বুকে মোহারী বাঁশী ।

তিনটি নিয়তি দুই বেলা আসে ছুন দিয়ে ছাওয়া ঘরে,
বাঁকা চাতুরীর মরাল গ্রীবায় তবু সারাদিন ভাসি
যোগীর অবোধ চিত্তের মতো নির্মল সরোবরে।

রাত্রে যখন ক্লান্তি, বুঝেছি বাজে মোহারী বাঁশী
ত্যাগের অগাধ সলিলে, হরিশ্চন্দ্রের সরোবরে॥

দ্বিতীয়ার্ধ

সমস্ত দিন জ্যোৎস্না হয়ে গিয়েছিল,
দোলনচাঁপা গাছের নিচে আমার বন্ধু এসে
চিনিয়ে দিয়েছিল আবার চন্দনের রং
শিশুর মুখে নারীর অংসদেশে ;
এবং যেসব পূর্বসংস্কার
দ্রাবিড় ভারতবর্ষে ছিল : পাখির পূজা জন্তুজীবাত্মার
গন্ধনিবিড় উপাসনা, উপাস্য এবং
উপাসকের উলঙ্গ শৃঙ্গার—
সেই স্বদেশে গিয়েছিলাম বন্ধুর নির্দেশে।

তাহলে কি সমস্ত রাত তেমনি জ্যোৎস্না হবে ?
চেয়ে দেখি চন্দ্র এসে পাপীর হাতের ছাপ
সুষুম্নার মাপ
তুলে নিয়ে আমায় দেখায় ; দিনের বেলায় তবে
বন্ধুকে আমার
দস্তানা বানিয়ে আমি বিমিশ্র বাস্তবে
কঠিন সত্যে স্বপ্নের উত্তাপ
নিয়েছিলাম ? বন্ধুকে দস্তানা
বানিয়ে নিয়ে কেন আমি প্রচণ্ড রোদ্দুরে
টাঙিয়েছিলাম প্রকাণ্ড এক স্নিগ্ধ শামিয়ানা ?
দেবদারু ডাল রোমশ হাতে ছেড়ে আমার সুযোগগুরু ডানা॥

সর্বস্ব

যা-কিছু নিয়ে খেলা দেখাতাম
সেই আকাশ-ছোঁয়া তাঁবু,
ঢাল নেই তরোয়াল নেই সেই অতীন্দ্রিয় নিধিরাম সর্দার
আর সর্বময়ী মানবী আমার আর
বাঁকুড়ার গোল-গোল তাদের জীবন্ত দশাবতার
তারা এখন কোথায় ? কেঁদুলির মেলায় ?
কে তাদের খাওয়ায় পরায় ?
কোনো নৌকো নেই তাদের কাছে যাবার।
তাদের মুখের আদল, কথার নকল, হাঁটার ধরন
নক্‌শি-খাতায় তুলে রাখিনি, রাখলে বরং
বাকিটা জীবন খেলা দেখিয়ে যাওয়া সহজ হত।

সেবার যখন মানভূমে খেলা দেখিয়ে ফিরছি
অচেনা একজন বন্ধু রাস্তা থেকে বুকের ভিতরে উঠে এল,
হাজার ডাকলে কথা কয় না, কানে নেয় না,
সঙ্গে থাকে, সঙ্গে-সঙ্গে থাকে,
এটাই নিদারুণ গুণ তার ভয়ংকর দোষ.
কোনো একটা নতুন খেলার মহড়া তার সামনে করলে
কিছু বলে না, ফিকির-ফন্দি বাৎলে দেয় না, কিন্তু
যখন খেলা দেখাই মঞ্চের উপর সামনে থাকে ;
তাকে নিয়ে খেলা দেখালে আমার কোনো খেলাই উৎরোয় না
সে আমার খেলায় সবচেয়ে ক্ষতি মারাত্মক মুশকিল,
তবু তাকে ছাড়া আমার কোনো খেলাই দেখানো হয় না॥

করুণা

মাঝে-মাঝে মৃত্যু এসে কথা বলে পৈশাচী প্রাকৃতে,
এ ওকে সুযোগ বুঝে "বাছা আর ছয়ছাগশিশু"
বলে খুব কাছে নিয়ে স'পে দেয় প্রজ্বলিত ঘৃতে,

সেই মৃত রমণীর কানের ঝিনুকে ঢেলে কিছু
চিত্রিত করোটি হাতে বহু-উৎসব করে পৃথিবীতে ;
মাঝে-মাঝে তুমিও কেমন যেন ভীষণ অনৃজু,
ভুরুর কৌটিল্য থেকে আরো বেশি তির্যক নিভৃতে
সরে যেতে যেতে শেষে ফিরে এসে অবাক করেছ।

এই কি তোমার রীতি, মুখোশের নিচে ঝর্ণা বয় ?
রুক্ষ উপেক্ষার তলে রুক্মল মখমল শিহরে,
শকুনি পাখিরে মেরে বহির্দ্বারে টাঙিয়ে ভিতরে
আস্তৃত করেছ আভা, যান্ত্রিক দুর্যোগে যেন 'ক'য়ে
শোনা যাচ্ছিল না কিছু, 'খ'য়ে চেনা নারীকণ্ঠস্বরে
গান শুনি, তুমি কি পাগল হলে হে করুণাময় ?

স্থগিত

কেউ কিছু মনে কোরোনা আমার সে সব প্রতিশ্রুতি
এখনো যদি স্থগিত রয়, মনে করিয়ে দিয়ো না আমি
নিজের শক্তি বোঝার আগেই শঙ্কিত সেই শপথগুলি
উচ্চারণ করেছি কেন ? আমার হাতে যে-শিশু দুটি
পরিচর্যা পেয়েছিল, হঠাৎ কেন অতর্কিতে
পথের বাঁকে রেখে এলাম, কেন তাদের মালতী-পুঁথি
জলের দামে মনোজ্ঞানীর গ্রন্থাগারে দিয়ে এলাম ?
যাকে দেখলে এখন কেন গান বাধি না আগের মতো ?
যে গেছে তার নামের আগে 'উন্মাদিনী' কেন বসাই ?
যখন দেখি আকাশ ছেয়ে শরৎ নামে শাদা পাখির
আমার শুধু চোখের দেখা, তাছাড়া কিছু পারিনা আর,
যখন দেখি বস্তি পাড়ায় শিকার-শুয়োর বাঁচিয়ে রেখে
এক-এক করে শরীরাংশ-মাংস কাটে জল্লাদেরা
আমার শুধু চোখের দেখা, আমার শুধু কান্না-পাওয়া,
হাত-পা বাঁধা এখন আমার আলোয় এবং অন্ধকারে।।

প্রতিদিন সূর্যের পার্বণ

উৎসর্গ

দিলীপরঞ্জন দাশগুপ্ত

ভয়ানক ভালো ওরা

যে এসে তোমাকে রোজ অপমান করে,
তুমি যে-দর্জির হাতে শরীরের মাপ রাখ,
যে এসে তোমাকে রোজ ভালোবাসে,
তুমি যে-পাথরখানি প্রিয়তমা ভেবে ভালোবাস,
যে-অসতী কোটায় টগরফুল নিজের গরজে,
যে-অতিথি পিঠের পিছন থেকে ঘর ভাঙে,
যে-নারী শিশু ভাঙিয়ে ভিক্ষা চায়,
যে-কিশোরী চশমার ভাঁজে ভাঁজে আবির বিঁধিয়ে চলে যায়,
মূর্তিমতী যে-অবিদ্যা সাময়িক উদ্ধত দয়ায়,
যে-পোকা বুকের মধ্যে চিত্রকল্প কুরে-কুরে খায়,
প্রত্যেকে ঝুলিয়া ওরা সিন্ধুজলে তোমার অধ্যায়।

অহরহ সুখ

প্রত্যহ ঘেঁষে একটি সারস অন্তত একবার
ডানা মেলে ধরে, কিছু নিতে চায় সবার রেকাবি থেকে ;
কলাবতী-লাল স্কুল-বাস থেকে ছোট্ট মেয়েটা হেসে
সাতটি হত্যা প্রতিহত করে। বিগত নারীর মুখ
অভিনেত্রীর ভঙ্গুর মুখে ভেসে ওঠে, একবার
ভাবি টেলিফোন তুলে ধরে ফের কান্নায় ভেঙে পড়ি,
সঙ্গে সঙ্গে কোন্ পিরিয়ডে কোন্ ক্লাস মনে পড়ে ;
বোকা বেয়ারার সাইকেলে সেই বেতের ঝাঁপিতে রাখা
সারাটা দিনের টুকিটাকি সব, আমি যেই কাছে গিয়ে
বোকা বেয়ারাকে তাদের পাড়ার রামনবমীর চাঁদা
দিতে যাই দেখি তার অভাবের মরুভূমি ছেয়ে ফেলে
যথাযথ এক রজত সারস নিচু হয়ে উড়ে যায়

স্নিগ্ধ প্রতিশোধ

আমি সূর্যের জন্য পানীয় ঢেলে দিচ্ছিলাম
আমার বেতের চেয়ারে বসে ;
তুমি পড়োশির ছোটো মেয়ের জন্য কার্ডিগান
বুনছিলে এক অনিন্দ্য সন্তোষে ;
বলা ভালো, সূর্যের উদ্দেশে আমার আতিথ্য
প্রতিবেশীর প্রতি তোমার দায়িত্ব
অনন্তকাল সমান্তরাল চলার পর
চেয়ে দেখছি ভূমিবিহীন আমার ঘর।

সূর্য জানেন তাঁকে সাদরসম্ভাষণে
আমি কেমন সপ্রতিভ, একই ধরনে
এগিয়ে তাঁকে বসতে বলি, এটা বা ওটা
দেখতে দিই, তিনিও জানেন আতিথেয়তা

প্রতিশোধের শিল্প আমার ; সমস্ত দিন অন্তহীন
খেলিয়ে তাঁকে বিকেলবেলায় ডাঙায় তুলে বলব : মীন,
কোথায় তুমি রেখেছ তাকে ?   সদুত্তর না পেলে তবু
উষ্ণ চায়ে পাত্র ভরে বলব : গলা ভিজিয়ে নিন।

নারীর নিজস্ব

একমাথা চুল নিয়ে ভালোবাসতে এলে
পুরুষ আমার,
মুহূর্তে ভেবেছি আমি চারদিকে দেয়াল তুলে দেব
ভালোবাসবার
অবকাশ পাবে তুমি। খয়েরি রঙের সূর্য জ্বলে উঠে জ্বলে
গলে গেলে তবু
টালির ছাতের রাঙা চৌকো বেয়ে তরতরে চাঁদ
ছেলেমানুষের মতো নেমে গেলে তবু
একমাথা চুল নিয়ে ভালোবাসবে যুবন্ আমার
সারাদিন সারারাত দিন সারারাত
হীরের চিরুনী দিয়ে ওরা যদি তোমার চুলের
পরিচর্যা করতে আসে, তুমি, শুভ্র দুর্নীতি আমার,
প্রকাশ্যে আমার বুকে মাথা রেখে দাউদাউ কাঁদ।

অতীন্দ্রিয় মাকড়সার মতো

আমার ঘরের দেয়ালে পনেরো শতকের গির্জের একটা লাতিন স্বরলিপি আছে
বড়ো-বড়ো হরফে লেখা, কিন্তু আমি তার এক অক্ষরও বুঝতে পারি না ;
এবং সেজন্য কোনো অনুতাপ নেই। আমি মাকড়সার মতো ঐ গান
ঘিরে থাকি ; উপমেয়-উপমান ভুলে যদি সত্যি আমি ঊর্ণনাভ হয়ে যাই তবে
কেউ এসে হাতে নিলে মৃত্যু তার প্রজ্ঞার মুহূর্তে হবে।

দম্পতি

ওদের মধ্যে একটা গাছের বৃত্ত বেশ ভালো

ওদের মধ্যে অন্তত দুই ঘর
দেশান্তর ভালো।

ওদের মধ্যে দশটি দিগন্তের
শোভন অন্তরালও।

কিংবা আরো যোজন সুদূর কৌম সভ্যতার
পার্বণের শেষে যেমন ভীবণ কাছে এসে দুজন
জল্লাদের খড়্গে শুয়ে মৃত্যুমিথুনমশাল ঝল্‌মলালো।

প্রতিদান

তিব্বতী বণিকসংঘ পশম চমরীপুচ্ছ লবণ সোহাগা
মৃগনাভি এনেছিল, যাবার সময় নিয়ে গেছে
তামাক ওষুধ চিনি ধাতুপাত্র ; এবং সেদিনও
তিব্বতের তুলো দিয়ে কাংগ্রা কিংবা কুলু উপত্যকা
বিনিময়ে কত জামা বুনে দিত, সেই কথা ভাবি।

ভয়াল দুপুরে আমি বুঝেছি প্রাণীর কাছে তৃণ
চাইলেও হতে হবে বণিকের মতন মেধাবী।

পাখির সঙ্গে পটুয়ার খিটিমিটি

বেগুনি দুর্গাটুনটুনি জানে কী পর্যন্ত
মুহূর্ত দিয়ে ছবি আঁকা চলে মহানিম গাছে,
আমাকে বলল : 'আপনি একটা ছবি আঁকুন তো

শুধু মুহূর্ত জড়ো করে ?'   আমি শিল্পঘরাজে
তার কথা শুনে ছবি এঁকে নিতে হন্তদন্ত ;
শয়তান পাখি বিদ্রূপ করে বলে 'ভদন্ত,
মিছেমিছি কেন কিচিরমিচির আনাচে-কানাচে

দেখি মুহূর্ত নিজে অহেতুক ছবি হয়ে আছে ॥

ভুক্তভোগী

হুবহু বিবাহিত তিনটি লোক
অবিবাহিত থাকে দিনে,
জীবিকা নির্বাহ করে নিছক
দখিনা বাতাসের ঋণে ।
অথচ প্রত্যহ দেখি তাদের
পাখা গজায় রাত্তিরে,
নিমজ্জিত করে সধবাদের
ভোগবতীর কালো নীরে ।

তবুও পূজা করি আমি তাদের
শেষ রাতের সুপ্তিকে,
বিবশ হাতগুলি কৃশ চাঁদের
খেয়া ভাসায় পুবদিকে ।

আমাকে তবু তুমি অবিশ্বাসী হতে বোলো না

টেডি-বালক জামার পিঠে বুক-সাঁতারু বারুদ-নারীর ছবি
পোষণ করে ; পূষণ তুমি রাগ কোরো না,
আমার ঘরে যারা আসে কেউ প্রিয়া কেউ অবান্ধবী
পূষণ তুমি রাগ কোরো না, লক্ষ্মী সোনা ।

ওরা সবাই মশাল জেলে দুপুর বেলায়
এ ওর মুখে নানা রকম মুকুর হেলায়

এ ওর উপর খেয়ালখুশির ফুকুর লেলায়,
মেয়ে তো নয় কয়েক গুচ্ছ প্রবঞ্চনা…

একটি নারী আমাকে খুব ভিতর থেকে
টান দিয়েছে, আমার গহন শিকড় দেখে
খুব পছন্দ হয়েছে তার দ্রুতবেগে,
কবুল করছি সব ঘটনা :

উঠোন-ভরা জলের উপর নৌকো ছেড়ে
তোমায় খেলা দেখাচ্ছিলাম, কপালফেরে
আমায় ছেড়ে তোমার কাছে গিয়েছে সে—
পুষণ তুমি রাগ কোরো না ॥

আত্মনিবেদন

তোমায় ঘিরে হাজার লক্ষবার
বলব, গৃহস্বামি,
যত্তে, রূপং কল্যাণতমং
তত্তে পশ্যামি।

আমি একজন দারুণ মূর্খ লোক
বাঁচতে গিয়ে শেষে
দেখি অঢেল অশেষ দুর্ভোগ
নিজের নির্দেশে।

ছুটতে গিয়ে দেখেছি রেললাইন
কল্যাণসঙ্কেতে
মিশে আছে, হঠাৎ পড়ে গেছি
বিলুপ্ত ফিশ্‌-প্লেটে।

আমি একজন বোকার হদ্দ বোকা
তা সত্ত্বেও জোরে
বলে উঠি তুমি আমার দলে
খেলতে আসবে ভোরে ॥

রক্তাক্ত ঝরোখা

মারাঠি প্রজাপতি আমার, ঘুরে-ঘুরে ঈশ্বরের পায়ের কাছে
অভঙ্গ শোনাও,
বাঙালি ভালবাসা আমার, কবিওয়ালার ধরনে তুমি কিছু
ঢাক-আখড়াই গাও—

দেখতে-দেখতে আমি কেমন প্রিয়তমার বুকের নিচে
আলোর প্রজাপতির পাশেই স্পর্শপ্রবণ পুতুল শোয়াই,
কত সহজে আমার শরৎ চৈতালির আষাঢ়ে ভিজে
দিগ্বিদিকে ফেরার হল। এবং ভগবানের দোহাই
চিত্রিত কাঁচুলি জুড়ে বিশ্বভুবন দেখতে-দেখতে
আমি সেদিন বলেছিলাম 'আল্লা মেঘ দে' 'আল্লা মেঘ দে'
তোমার দয়ায় আজকে আমার ঘরে ভাণ্ডার মেঘের মজুত,
আমি সেসব মেঘের ধারায় অবিশ্বাসের সকল খোয়াই
মুছে দিয়ে তোমার কাছে দাঁড়াব খুব অপ্রস্তুত।

প্রেমিকের সংসারে

নাকের একটি নথ

চোখের সামনে শুধু মিলায় নিজস্ব রাজধানী,
পল-বিপলের কত শহর রক্তে উপার্জিত,
ভিতরবাগান ঘুরে এসে একহাঁটু জলকাদা,
যা ছিল খুব আলুথালু, ক্রমশ মার্জিত।

চোখের সামনে মিলায় আমার বলিষ্ঠ দুই হাত,
ভালোবাসার উঠান জোড়া মেধাবী নীল তাঁবু,
অবাধ্যতা শিখেছে সেই অঙ্গনার গ্রীবা,
ভ্রাম্যমাণ এখন সেই মুখাপেক্ষী পাহাড়।

চোখের সামনে মিলাল তার রাঙা পট্টডোরী,
সুবর্ণের কড়িবউলি দুখানি হাত খোঁজে,
পথ সরে যায়, অথচ আজ ঘরহারা চৌকাঠে
চোখে-চোখে আগলে রাখি নাকের একটি নথ ॥

জেরা

তুমি তাকে দেখেছিলে?
দেখেছি বলেই মনে পড়ে।
প্রথমে কোথায়?
সেই সুবিমল চৌধুরীর ঘরে।
কোন্ অবস্থায়?
আনি এ প্রশ্ন আপত্তিকর, বলি।
কেমন গায়ের রং, শুধু শুভ্র?
শুধুই কজ্জলী।
তার সঙ্গে আর কারা লিপ্ত ছিল?
বলতে পারি না।

তার সঙ্গিনীরা ?

নীলা, শকুন্তলা, ক্লারা ব্যালেরিনা।

তার গতিবিধি জান ?

পরিব্যাপ্ত গ্রামে ও নগরে।

এখন কোথায় ?

কেন, সে আমার ভিতরের ঘরে॥

নির্বাসন

আমি যত গ্রাম দেখি
মনে হয়
মায়ের শৈশব।

আমি যত গ্রামে যত মুক্তক পাহাড়শ্রেণী দেখি
মনে হয়
প্রিয়ার শৈশব।

পাহাড়ের হৃদয়ে যত নীলচে হলুদ ঝর্না দেখি
মনে হয়
দেশগাঁয়ে ছিল কিন্তু ছেড়ে-আসা প্রতিটি মানুষ।

ঝর্নার পরেই নদী, নদীর শিয়রে
বাঁশের সাঁকোর অভিমান
যেই দেখি, মনে হয়
নোয়াখালি, শীর্ণ সেতু, আর সে-নাছোড় ভগবান।

ভাঙা সাঁকোর ধারে

মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা
গভীর নিদ্রা, কপট নিদ্রা।

এ যেন এক জলসাঘর
ওংকারনাথ গাইছেন গান,

পারিজাতের বাগান ফুটছে,
শ্রোতারা তবু নিদ্‌পাথর ;

গভীর ঘুমই কপট ঘুম,
নইলে আপনি জানেন কি
সুরশৃঙ্গার হত সবাই
কিংবা নিদেন সারেঙ্গি।

সত্যি, সত্যি
অবনীন্দ্রনাথের গল্প।

সারা জীবন খুলব জানলা
স্বপ্নে যেমন বুড়ো আংলা,
আর জমাব এটা-ওটা,
মধু রাখব দু-তিন ফোঁটা।
দিন ঘনালে সপ্রতিভ
আঁকব ব্রতের আলপনা,
শুনতে চাইব আবার বলছে
বাংলাদেশের অঙ্গনা

আর্শি, আর্শি,
আমার স্বামী পড়ুক ফার্সি।

বধূবরণ

পানের তলায় তোমার মুখ ঢাকা,
বাইরে আমি দাঁড়িয়ে,
পানে ঢাকা তোমার মৌন মুখ,
মুখর আমি বাইরে-বাইরে ঘুরছি।

গোধূলি এল গোখুররেণু মাখা,
হাত-বাড়ানো একটি ভিক্ষুক
চৌকাঠ মাড়িয়ে ;
ফিকির খুঁজে আমি তোমার দয়া কুড়োচ্ছি।

আমি তো এক শখের নিছক শব্দব্যবসায়ী,
আনন্দের ক্লান্তি আনে আমার চোখে ঘুম,
পানের তলায় ঢাকা তোমার মুখ
স্তব্ধকল্পদ্রুম।

জানলা ভেঙে চোখে পড়ল, এখনো সেই বেঁচে
পার্শিদের গোরস্থান—নিষ্ফলা পাষাণ,
চোখ ফেরালাম, দুটি পানের মন্দিরায় বেজে
তোমার মুখ বাঁচা-মরার অতল ঐকতান।

শুধু সবুজ

সারা দুপুর শুধু একটা সবুজ আমলকি
নম্র হল নম্র হল আরো,
দু-ধারে তার দারুণ দুপুর শিউরে-শিউরে গেল
এমন কি সেই পারুল।

সারা দুপুর শুধু একটা সবুজ আমলকি
নম্র হল নম্র হল বুকে,
ওদিকে এক প্রেমিক তখন মালঞ্চের মাঠে
ডরাচ্ছিল জীবনকে, মৃত্যুকে॥

কন্যা

আদুল গায়ে বাইরে আসিস না,
না-হয় তুই তিন বছরের মেয়ে,
কিন্তু ওদের প্রচণ্ড তৃষ্ণা,
কোথায় কাকে রিপুসোপান বেয়ে
কীভাবে নেয়, বলতে পারিস তা ?

তোকে যদি আমার বাঁধন থেকে
নিয়ে যায় ঐ অশথ পেরিয়ে,
নিয়ে যায় ঐ গলির মধ্যে বেঁকে
তোর দিদিমার দু-চক্ষু এড়িয়ে ?
যদি তোর ঐ কালো চোখের মণি
বিদ্ধ করে ভিক্ষে করার ভাষা
শিখিয়ে দেয়, তবে আমার বাসা
গুঁড়ো-গুঁড়ো হবে যে তক্ষুনি।

কাছে আয়, তোর বুকে যতক্ষণ
মাথা রাখি, অজস্র বকুল
ঝরে পড়ে, ওলো আমার ফুল,
তোর কী সাহস, করিস আমাকেই
রক্ষণাবেক্ষণ !

দুই দম্পতির কাছে

দম্পতিকে বলেছিলাম দু-জনকে বিবাহ
দেব আবার পরস্পরের সঙ্গে। সেই শুনে
সেই সাবালক পুরুষ হঠাৎ ঝাঁপ দিল আগুনে,
সেই নারীটি অন্ধকারে জীবিকা নির্বাহ…

দম্পতিকে বলেছিলাম : দু-জনকে আমার
পালঙ্কে আশ্লেষে রেখে আমি আকাশ পেতে
বাইরে শুয়ে থাকব। শুনে নিজস্ব খেত-খামার
দেখতে গেল পুরুষ, তবে বিবাহ-বিচ্ছেদে
কী অপরাধ? উপরন্তু সে-ঘরের মেঝেতে
আমারও কি হয়েছিল এক ঘুমে রাত কাবার?

নর্তকী

পিঠের জামার বোতাম এঁটে নিতে
যেটুকু সময়
লেগেছিল, তারি মধ্যে দেহশরীরময়
লহর তুলেছিলে তুমি ; আমার মৃত্যুভয়
চূর্ণ করে দেবে বলে নিম্নগ বেণীতে
অগ্নিকুণ্ড জ্বেলেছিলে ; চূর্ণ করে দিতে
আরো একটু সময় লাগলে কী আর কালক্ষয়
হত বল? কিন্তু তুমি লাস্যের চকিতে
বশ করেছ মৃত্যুকে, হে মৈত্রেয়ী প্রলয়।

মাঝরাত্রি

সে আমায় পূজা করে যেতে
এসেছিল। আমার তখন
মাঝরাত্রি, ঘুমে কাদা। জতু
গড়িয়ে পড়েছে মুখ থেকে
বালিশে। জিহ্বাগ্র লেলিহান
সর্পিষ্ণু, স্বপ্নের স্নিগ্ধ তৃণ
জহ্লাদের মতো ছিন্ন করে

নগ্ন দাঁতে, তবু সেই ফণা
উদ্যত আবার। সে আমায়
এরি মধ্যে পূজা করে যেতে
এসেছিল। তখন আমার
সাময়িক শব পড়ে আছে
বিছানায়, অসভ্য অলস
মস্তিষ্ক তখন শয়তানের
গবেষণাগার, বিচক্ষণ
বাক্‌পটুত্বের মুখচ্ছদ
অপসৃত বিলক্ষণ। তবে
পূজা করতে কেন এসেছিল,
বিশেষত যখন আমার
পায়ের কাপড় সরে গেছে।

পুরুষ

তুমি কোন রন্ধ্র খুঁজে বিদ্যুতের প্রায়
তৃণের অরণ্যে গেলে ঢুকে,
অন্য-অন্য রমণীরা অঞ্জনার মতো অসহায় :
বর্বর বায়ুদেবতা তাদের কাপড় দূরে ফেলে
নরক গুলজার করে একা-একা, আমি পাপ করা যায় কিনা
এই মর্মে অভিধান থেকে অভিধানে
ঘুড়ির মতন ছুটে নিজ করোটির অভিমানে
ফিরে আসি—কাজ না হাঁসিল করে—আর তীব্র বীণা
তৃণের অরণ্যে বাজে, যে বাজায়, গায় যথারীতি :
'কিছুতেই কেনা যাবে না খুঁতখুঁতে পুরুষের সিঁথি।'

২

উদ্ভট.

সমস্ত শিখেও খুব অশিক্ষিত রয়ে যায় বলে
কোনো ভদ্রলোক রাত্রে থাকতে দেয় না;

একবার কোনো-এক ভদ্রঘরের সুনয়না
তাকে জননীর মতো কোলে
টেনে নিয়েছিল, কিন্তু সে চেয়েছে নির্গুণ ব্রহ্মের মতো বট
একরাশ ফুলের জঙ্গলে।

৩

ভীষণ একটা শাস্তি দাও আমাকে,
একেবারে শিকড়ে দাও টান,
নতুন শিকড় হতেও সময় লাগে,
দয়া করে আমাকে তার আগে
নির্বিচারে কর ছত্রখান।
আমি একবার পলিথিনের পরীর
শব্দ পেয়ে সমস্ত বাগান
খুঁজে এলাম : সকলি সুনসান ;
নকশা তোমার কেমন তৈরি থাকে !

এই আসনে শুকাও আমার শরীর।

৪

পেট্রোল পুড়িয়ে চলল ফিস্‌ফাস্‌-চক্রান্তে মফঃস্বলে,
সাত খুন মাপ জেনে তারা শালবনের অন্দরে
সাড়ে-ছটি খুন করে দেহগুলি চিন্ময় বল্কলে
ঢেকে উপহার দিল পাড়ার মোড়লকে লগ্ন ধরে—
আমি সবই জানতাম ! আমাকে পুরুষ বলা চলে ?

৫

নিরপেক্ষ মধ্যপথের হিরণতৃপ্তি বুকে আঁকড়ে
চলতে যাব এমন সময় তুমি আদিম রক্তহ্রদে
নেমে আমায় জড়িয়ে ধরে ঠোঁট দিয়ে খুব তলায় হাতড়ে
খনিজ কোন প্রদীপ আনলে, তারপরে সেই প্রদীপ ভাঙলে
আছড়ে ফেলে পাড়ের উপর ; অন্ধকারে আমার ধূপ-ধুপ
জ্বলছিল যেই তুমি তখন হাসছিলে খুব একতলাতে।

প্রসাধন

মুখের লণ্ঠনখানি তুলে ধরে তুমি
লজ্জায় অথচ অসঙ্কোচে
আপাতত রাত্রি মুছে নিলে
নিজের গরজে ;
গরমিল বলা যায়, কেননা মুখের
লণ্ঠন সরালে
যে-রাত্রি সেই রাত্রি, সব পুরুষের
মহা-অন্তরালে

রাত্রি আছে সেই কথা বুঝেছ কি তুমি ?
কিংবা না বোঝার
ভয়ানক ভান কর ? যাকে নিয়ে ভান
তুমি আজ তার
দয়িতা, তুমি এখন দয়িতা দয়িতা
তীব্র এই মোহের প্রশ্রয়ে
নিজেকে ভোলাতে চাও, তীরন্দাজ-সম
কেমন সহজে ধর গোল আয়না ভাবি ভয়ে-ভয়ে ॥

আঙ্গিক যেন না ভুলি

ভালোবেসে আগে মেনে নাও, পরে তর্ক কোরো,
তাহলে তর্কে ঝরবে রৌদ্র, মানবিকতা ;
হিংসা হবে না, এ ওর মনীষা শ্রদ্ধা করে
দাঁড়িয়ে উঠবে থরে-থরে শত সূর্যমুখী
এবং বুঝেছ, তবে তোমাদের সভাগৃহ
অমূর্ত এক মালঞ্চ হবে কথাচ্ছলে।

তোমরা তর্ক করতে জান না, হৃদয় থেকে
প্রথমে তো আন শ্বেতকাঞ্চন একটি-দুটি,

'তারপরে তুমি প্রিয় নারীটির চুল দেখাবে
প্রতিপক্ষেরে, সবশেষে তুমি অন্তমমে
পরিপ্রশ্ন জ্ঞাপন করবে অতর্কিতে—
কেননা আমরা সমবেত এক সেনাবাহিনী
শত্রু তো নেই, ছদ্মযুদ্ধে কখনো মাতি,
যেন আঙ্গিক না ভুলি, অযুত সূর্যমুখী
দলাদলি করে, ছায়া ছল্‌কায় নদীর জলে ॥

ধাঁধা

একটা শালিখ অমাঙ্গলিক, দুটো শালিখ ভালো,
তিনটে শালিখ শুধু চিঠির ডাকঘর বসাল।

'চিঠি, শুধুই চিঠি ?'
কোটর থেকে তক্ষকটা হকচকিয়ে কেশে
অবশেষে হাসল মিটিমিটি।

একটি নামের বানান ভেঙে সাতটা প্রজাপতি
বানাতাম, আর বানাতাম গাথাসপ্তশতী।

'গান, শুধুই গান ?'
দোজবরে এক ফাজিল বুড়ো আমারি উদ্দেশে
সকৌতুকে করল মদ্যপান।

পৌরুষেয়

মেয়েলি কথাবার্তা চলে ও-ঘরে,
আনন্দের গোঙানি বাজে, ঘুঙুরে গজগামিনী,
অমানিশার শঙ্কা নেই ও-ঘরে,
স্বর্ণঘট শরীরে ধরে কামিনী,
দ্বিপ্রহরে ব্রীড়াবনত উপশমিত নগরে
মেয়েলি কথাবার্তা চলে ও-ঘরে

রয়েছে সে-ও, সন্নিকটে যে হবে তোর ঘরনী ;
একেই ধ্রুব সুযোগ বলে, এমন ধ্রুব সুযোগে
আগুন জ্বাল এ-ঘরে, তোর সকল উপকরণই
পূর্ণতার অভাবে বড়ো ফ্যাকাশে লাগে দু-চোখে ;
এ-ঘরে জ্বাল আগুন, ওরা কথা বলুক ও-ঘরে ॥

বেহায়া সময়

শ্রীনিকেতনের মোড়ায়
প্রেমিকযুগল দুপুর ওড়ায় ।

সময় আকাশ থেকে
বিরক্ত : 'কে ওখানে হাসছে কে

কিংবা কান্না ? আহ্লাদী-অমরু ?
শ্রীনিকেতনের মোড়া, না ডমরু ?'

ভাবতে-ভাবতে প্রধান প্রশ্ন থেকে
সরে গিয়ে মাধ্যাকর্ষ বেগে

সময় ঘোরে তূর্ণ কিন্তু ধীরে
সুমধ্যমা মোড়াকে ঘিরে-ঘিরে ;

দুপুর যখন দাঁড়াল চৌকাঠে,
প্রেমিকযুগল বেড়াতে গেল মাঠে ;
সময় তবু পুত্রকে দেখিয়ে
ঘরের মধ্যে ঘুরছে ভার্যা নিয়ে ॥

বাজি

শান্ত একটা লণ্ঠন দাও। তার নিচে বানাব
অশান্ত চরিত্র।
দশ-বারোজন শয়তান দাও, গড়ব অমিতাভ
সংঘমিত্র।

নারী-নিবাসের মেট্রন দাও,
স্পর্শভীরু নিশিগন্ধাও,
এক মুহূর্তে গড়ব দুঃসাহসিক তথ্যচিত্র॥

বৃষ্টি আমার কাছেই আছে

বৃষ্টি এলে তোমার কাছে থাকব,
ভারতবর্ষ দেয়নি কোনো বাধা
শুধু দেখি কোথাকার কে-একটা
ভিখারী রয় কাদাডোবায় পড়ে।

যেই না তাকে তুলতে গেছি দেখি
সবাই আমায় সংস্কারক বলে
সারমেয় লেলিয়ে দিল পিছে,
এবং দেখি সেই ভিখারী চেঁচায়
নিয়েছি তার কপর্দক লুঠে,
এমন কি তার বধূর কূর্পাসক।

অমনি তুমি দূর-জানালা থেকে
ছিটকে গেলে আমায় ঘৃণা করে,
আত্মপক্ষসমর্থন জোরে
করতে গিয়ে ভেবে দেখছি ঠেকে
মার-খাওয়া বেশ নরম পরিশ্রম—

বৃষ্টি আমার কাছেই আছে ওরে!

পিতার প্রতিমা

মালীর অভাবে পিতা বাগানের ভার নিয়েছেন।
এমন সন্দেহ নিয়ে প্রতিটি বৃক্ষের দিকে যেতে
কাউকে দেখিনি আমি।
'লতানে জুঁইয়ের নাম করে ওরা ঠকিয়ে আমাকে
ভুল গাছ দিয়ে গেছে' শুনি তাঁর দারুণ চিৎকার,
যেন মৃদু পাপে গুরু শাস্তি দেবেন ;
আমি ভয়ে-ভয়ে ঘুরি ঝুল-বারান্দায়
'এনেছি লতানে জুঁই' এই বলে চালিয়ে দিয়েছি
আমিও, এ-পর্যন্ত, ফেরার মালীর মতো পাপী,
যদি দণ্ড পাই সেই তীব্র ভয়ে দূরে-দূরে ঘুরি,
কর্মরত পিতার প্রতিমা তবু দেখা চাই, তাই
চতুর সামীপ্যে থাকি যেখানে পিতাকে দেখা যায়
অথচ আমাকে পিতা দেখতে না পান, সেইখানে ;
কিন্তু কে দেখেছে কবে কর্মরত পিতার প্রতিমা
তাঁর ঠিক পাশাপাশি না দাঁড়িয়ে ? আমি সুতরাং
পিতাকে অংশত দেখি, আপাতত দেখি
খুরপি কেঁপে যায় তাঁর ডানহাতে, খুরপিটা কেমন
অবাধ্য ছোকরার মতো শিস্ দিচ্ছে, তবু তাকে তিনি
বেত্রাঘাত না করেই গভীর সৌজন্য শেখাচ্ছেন,
স্পর্ধিত-বিনীত খুরপি কেঁপে-কেঁপে যায় ডানহাতে ॥

খেলা

কার কাছ থেকে উঠে এসে তুমি জড়িয়ে ধরেছ আমাকে।
ভয়ে-ভয়ে ভাবি মিথুনমুদ্রা মেনে নিয়ে হব নত ?
শরীর নামক নশ্বর যদি মানবদর্প না রাখে ?
না কি শরীরের গূঢ় অন্তর্গত

অথচ ঈষৎ অতিশায়ী হৃদি জেলে দেব নিশিনিদাঘে ;
কার কাছ থেকে উঠে এসে তুমি জড়িয়ে ধরেছ আমাকে ?

আমি ও-রকম বিভেদ বুঝি না, কোথায় শরীর, শরীর কোথায়
স্বরূপের স্রোতে একাকার, কোথা দু চোখের দীপ্তি ভেসে চলে যায়
নারীর চরণে,
আমি ছ-রকম দস্যু মানি না, দেখেছি শেফালি সে-ও দস্যুর
চক্রান্তের অছিলা, দেখেছি অসাধু ও সাধু মূঢ় ও চতুর
মৃদু আলোড়নে
সহসা কেমন অসহায়ভাবে এ-ওর বসুধা নিকটে ঘনায়
একে-ওকে নিয়ে, অথবা একাকী, যাতে নিরুপায় গোধূলিসোনায়
ব্যথার তোরণে।

কে তুমি আমাকে জড়ালে, কে তোর জননী বলো তো,
না কি তুমি শুধু কানীনা,
রক্ত ও ধ্যান মিলে-মিশে যায়, জলে চাঁদ ঝলে মহেশ যোগীর মতো
সত্য মিথ্যা জানি না।

সততা এবং পাপের ধারণা নিয়ে তুমি খেলা করবে সতত
বীণা ?

পুরোহিতের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর

বিকিনি-পরা বিদেশিনীর সহজ বিকিকিনি
চেন কি তুমি ? 'চিনি।'

ধানী শাড়িতে ধনী যখন তাকায় ভীরু-ভীরু
জান কি তাকে ? 'আমার দিকে ফিরুক।'

যদি না ফেরে, যদি শুধুই নিরপেক্ষ রহে ?
'দধীচিসম ধৈর্য বুক দহে।'

তাহলে তুমি দুঃখ জান ? 'বিলক্ষণ জানি।'
তাহলে কেন আত্মার বনানী
পিছনে ফেলে টেবল্‌টেনিস খেলতে গিয়ে শেষে
নাগরিকের চলস্রোতে হঠাৎ যাও ভেসে ?

'কি বোঝ তুমি, ঈশ্বরের ভাড়াটে সন্ন্যাসী ?
দ্যাখোনি বুঝি আমি যখন ভাসি
কোথাও কোনো বৃক্ষ গড়ে কোন সে-চিরায়ত,
আত্মা গড়ে কে কারিগর, আর সে দ্বিতীয়ত
বাঙালি কোনো মেয়ের মতো বিদেশিনীর মতো।'

ক্ষতিপূরণ

ভিড়ের মধ্যে সব সময় কেউ না কেউ থাকে
গুমরে উঠে দেবে দারুণ সান্ত্বনা আমাকে।

সেদিন তুমি সঙ্গে ছিলে, ঝড়ের মুখে হঠাৎ
আমার সঙ্গে ভেসে গেলে, আমার এমন বরাত
কুড়িয়ে পেলাম অপূর্ব এক অসত্যভামাকে।
এবং যেদিন সেই ভামিনী আমায় ফেলে দিয়ে
বিয়ে করল শশাঙ্ককে, সেদিন সবুজ টিয়ে
অসীম শূন্য ঘিরে-ঘিরে ঘুরল ঝাঁকে-ঝাঁকে।

আরেক দিনের কথা জানি, ভামিনী শেষ রাতে
আমার কাছে ফিরবে যখন, অজস্র আহ্লাদে
উপচে পড়ে আমায় নিয়ে আছড়াতে-আছড়াতে
খেলা করবে, শরীর থেকে ফাজিল অজুহাতে
পালিয়ে গিয়ে পাব সেদিন—কাকে ?

ধ্যানধারণার ভিড়ে

কলকাতা-সময় অনুযায়ী
সে আমাকে আত্মার আঁচলে নিল তখন রাত্রি দশটা।

এদিকে তোমরাই—তার অশুভানুধ্যায়ী—
মধুপুরে দেখেছিলে আমার অভাবে ঘুরছে শ্মশানে মশানে ছিন্নমস্তা।

যশিডি-সময় অনুযায়ী
ওঁরাও নারীর শুচ্ছে, রাত একটা, সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা।

ওদিকে উৎসাহী
তরুণ কবির ভিড়ে, ভবানীপুরে, রাত্রি দুটোয় তুমি আছুর মজদা।

এতগুলি ধারণার চড়াই-উৎরাই
ভেঙে যেতে-যেতে আমি অভিমানে ভাবি তুমি পিতৃকুলায়ে স্নেহে নষ্টা

অনাত্মপুত্তলী ; তুমি জেনেছ বিলীয়মান সব ধারণাই,
জঙ্ঘায় ত্রিশূল-চিহ্ন সহজ বিবেকে আঁকবে কোন শাস্তিদাতা ?

তিন সঙ্গী

বাগনানে যাবার পথে তিনটে বাচাল সঙ্গে নেব,
সারা রাস্তা কথা বলবে।
বাগনানে যাবার পথে কাদা ছুঁড়বে যে-কেউ আমাকে
তল্লিতল্লা থেকে অমনি তিনটে বাচাল কলকলাবে,
কথায়-কথায় তারা লোফালুফি করবে কলকাতাকে,
তাদের বাদিত্র জানি বড়ো জোর আম আঁটির ভেঁপু।

তাদের গোলমাল কিছু ভিন্ন ধরনের, থেকে-থেকে
শোনাবে ছড়ার ছন্দ।
স্টেশনে লোকাল থামলে তালে-তালে বলে উঠবে : "কে কে
লজ্জালতা করবে এস ঢেলে দেব মালতীর গন্ধ"—
ট্রেন চলতে শুরু করলে চোখা-চোখা শব্দের চেরাগে
এমন জ্বলবে যেন জোনাকি জ্বলেনি এর আগে।

বাগনানে পৌছব যেই আমার চৌহদ্দি সারা হবে,
বাচাল তিনটেকে ডেকে পয়সা দেব, এক মুহূর্তে ওরা
থেমে যাবে, সব পাগলাঝোরা
থামিয়ে এ ওর দিকে তাকাবে অকূল পরাভবে ;
কেননা আমি তো যাব ঘরনীর কাছে বাড়িতেই,
তিনটে বাচাল জানে তাদের কোথাও বাড়ি নেই।

চামুণ্ডা

আহত পশুকে পাখির মতন দেখতে ;
পেলব নীল পালক
আহত পশুর রক্তে,
সুতরাং তাকে পাখি বলে ধরা হোক।

আহত পাখিটি মানুষের মতো টাস্‌টাস্‌
প্রজ্ঞা বলছে, স্পষ্ট শুনেছি। সে-পাখি
নয় বিধাতার ক্রীতদাস,
জ্ঞানের ব্যথায় একাকী।

আহত মানুষ পশুর মতন, নখরে
আদিম পাথর, যতই টগর করবী
তাকে দাও, সে যে হাঙরের মতো গিলবে সে-ফুল হাঁ করে,
আমার অভিজ্ঞতায় সে এক মানবী॥

রক্তাক্ত ঝরোখা

রক্তাক্ত ঝরোখা

আমার বিষয়বস্তু : 'ঈশ্বর'। এভাবে যদি বলি
অঙ্কুরিত হতে পারে অনুযোগ তোমাদের মনে,
অথবা আমারি রক্তে, যে কথাই বলি, মনস্থলী
বিরুদ্ধ আবেগে কিংবা অনুষঙ্গের অনুরণনে
কেঁপে ওঠে ; তাই ভাবি, 'ঈশ্বর' বললেই ক্ষণে-ক্ষণে
বিদ্যুতের মহিমায় অনীশ্বর নরকের গলি
হঠাৎ ফুটে বেরোয়, শয়তানের ললাটে ত্রিবলি,
সন্ন্যাসীর ঘনশ্যাম বিশ্বাস রহে না ত্রিভুবনে।

আমার মন্দিরে তবে পশ্চিমি গির্জার দেখাদেখি
কাচের ঝরোখা গড়ি, স্টেইন্‌ড গ্লাস, নকশার উল্লেখে
এঁকে তুলি দাগী দস্যু, পুণ্যলতা, কুরূপা সুরেখী,—
এঁকে তুলি বৈরাগী আভোগী পাপী অথবা নিজেকে,
এসব চরিত্রছবি আমার হৃদয়রক্ত লেগে
ঘূর্ণিযোগে অবশেষে ঈশ্বরে পরিগণিত··· একি···

২

উপন্যাস লেখকেরা সবচেয়ে ভীতু, ভূমিকায়
এখনো লেখেন 'গ্রন্থে বর্ণিত চরিত্রগুলি সবই
কাল্পনিক, স্থান-কাল মনগড়া নিতান্ত লিচ্ছবি
অত্যন্ত অতীতে'—কেন ? না হলে স্রষ্টাকে কুরে খায়
সেসব চরিত্র নাকি ! এমন কি গ্রেহাম গ্রীন, হায়
অতিথি ছিলেন যাঁর, ফুয়ং নাম্নী সে-মহিলার
ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় : 'হে মাধবী',
ক্ষমা কর, শ্রবণসৌকর্যে ঐ নাম ব্যবহার
করেছি অপরসূত্রে।'
ওসব ছলনা রেখে, কবি,
উচ্চারণ কর, যথা ইস্পাতের দৃপ্ত জাহ্নবী
ধরে জ্যোৎস্না, কিংবা খর সূর্যের অমিত স্বেচ্ছাচার,

শুধু জেন একমাত্র মানদণ্ড নয় প্রতিচ্ছবি,
নিদারুণ গহ্বরগুলিয়ে ঢাকে অরণ্যঅটবী,
মুমূর্ষুকে যে বলে অপ্রিয় সত্য সে অতি নচ্ছার।

৩

দিনভর শ্রমিকতা ঈশ্বরের আঙুরবাগানে
সেই ভালো, তার মতো ভালো নেই, তার চেয়ে ভালো
আমার ভালো না। তবে ওরা কেন আমায় সাজাল
আতুর-সংঘের বক্তা, রিষড়ায় বালীতে বাগনানে
বন্যার্তের তহবিলে চাঁদা তুলতে টেনে নিয়ে গেল—

চাঁদা তোলা হয়ে গেল। এমন সময় চেয়ে দেখি
আতুর-সংঘের স্ফূর্তি, প্রতিটি সদস্য পিছলে পড়ে
পার্কের মসৃণ স্লিপে, একটি সদস্য—হয়েছে কি—
আমার মুখের পরে এই মর্মে মুষ্ট্যাঘাত করে
'তালব্য শ-য়ে আ-কার, তুই মেকি, আমরাও মেকি'—

বলে অস্থিমাংস থেকে আমার শরীর একটানে
খুলে দিল, 'শীত করছে' বলতেই সেই সংঘাতুর
কাদাপায়ে হাতির দাঁতের গড়া আত্মার আঙুর
দলে গেল, যেটুকু গড়েছিলাম ভোরের বাগানে।

৪

জানি কেউ নিজগুণে অথবা নিজেরই অপরাধে
শত্রু হবে, অথবা না জেনে তোমারও বৈরিতায়
অভিষিক্ত হতে পারি। কেউ-কেউ বৈরী হতে চায়
তা না হলে কিছুতেই সময় কাটে না। মধ্যরাতে
সহসা তোমারও কাছে অশ্লীল লেগেছে গৃহচ্ছায়!

ওরকম অতর্কিতে সুঁচে সুতো ভরে নিয়ে দাঁতে
ছিঁড়ে নিলে কেন! যেন ভয়ানক বড়ো-অনায়াসে
একবারও না তাকিয়ে আর-কারো ঘরের ফরাসে

বুটি বুনে দিতে পার ! যে যাকে পিছনে রেখে যায়
দেখেছি তোমার চেয়ে সে কাঁপে দু-মাত্রা অভিঘাতে।

সে যদি এখনই এসে তার মৃত পুরুষের মুখে
গঙ্গা-জল তুলে দেয়, আর একচড়া ভাত রাঁধে,
থালায় সাজিয়ে ডাকে 'খেতে এস'—সেই বাড়া ভাতে
চুম্বন দিলেই তুমি ছেড়ে আসবে নতুন প্রভুকে ?

৫

হেমন্ত বুদ্ধের ঋতু, জৈন সন্ন্যাসীর ঋতু শীত
কার ধর্ম বেছে নেব ? যজুর্মন্ত্রের উচ্চারণে
শরৎ সম্মোহ রচে অধ্বর্যু, অন্যত্র দুইজনে
ঘনায় শাওনমেহ গৃহকোণে, মাধবীকাননে,
আমি ভাবি সবচেয়ে ভালো নাকি হেমন্তনিশীথ
পথের ল্যাম্পপোস্ট যবে কুয়াশার দোলানো চামরে
সদ্য অতিথির মতো অপ্রতিভ, অসহায়, বোকা ;
আকাশের ওষ্ ঝরে ভিখারীর জটার কোটরে
অমিতাভ হিমবাহ গড়ে তোলে, হঠাৎ কী করে
তরী হয়ে ভেসে যায় সারি-সারি হিমানীকরকা,—
হরিণ, সুন্দর পাখি, যে-পাপী অনপনেয়, চোরে
নিয়ে গেছে যে-নারীর বহিরঙ্গ, তীব্র একরোখা
ক্ষুধার্ত বালক ভাসে নির্বাণের সুনীল সাগরে
বাতিঘরে হেমন্তনিশীথসূর্য রক্তাক্ত ঝরোখা।

ভিখারী, আপেল হাতে, অবিকল ঈশ্বরের মতো ;
সম্ভাষণে কাছে আসি, কিন্তু ব্যবধান বেড়ে যায়,
হাত ফসকে চলে যায় কোনো-কোনো পাপিয়ার প্রায়,
ভিখারী, আপেল হাতে।

আচমকা বাদুড় হয়ে থায়
একটা দিক, তারপর আমার দু-হাত ছেড়ে দিয়ে

ভিখারী আমাকে বলে আত্মমর্যাদায় ক্ষুণ্ণ কত
বোকা লোক ফিরে গেছে অর্ধভুক্ত আপেল এড়িয়ে ॥

৭

অভুক্ত দেবতার অর্ঘ্যের আপেল চিরে রক্ত
আমি সইতে পারছি না। 'তুমি না পুরুষ বলীবর্দ'
বলে যত মারাত্মক সান্ত্বনা জাগাতে চাস তত

ভয় করছে। বেদীর মতো টেবিল, ফুলদানির বুকে
আপেল রেখেছিলাম, পৃথিবীর প্রথম শিশুকে
নাগমাতা যে-রকম প্রকৃতির দারুণ দুর্যোগে

পালন করেছিলেন, আমিও ভেবেছি সেইমতো
জগতের মহাপ্রলয়ের সঙ্গে বাজি রেখে শত
অর্ঘ্য দেব দেবতাকে। কিন্তু দেখি সহসা নিহত

সে-আপেল অসহায় বিকেল বেলায় আছে পড়ে,
'নিজে যা পারে না, কেন অন্যের উৎসর্গ পণ্ড করে
ওরা তার স্বাদ পায়?' বলে এক কুমারীর ক্রোড়ে

রক্তে-ভেসে-যাওয়া সেই নৈবেদ্য সাজিয়ে চেয়ে থাকি,
গোধূলির বিন্ধ্যাচলে আমাদের অকৃতার্থতা কি
অর্ঘ্য ও দেবতা মিলে আমাদের শতাব্দীর পাখি?

৮

আমাকে দেখিয়ে কেন সারা জগতের নীল শিশু
পশম বিলিয়ে চলে যায়;
ঐ শিশুদের মতো সৃজনবিলাসী কোনোদিন
দেখিনি কোথাও;
—'তোমরা কোথায় যাও?' 'সৃষ্টির সভায়।'

প্রতিযোগিতায় নেমে পরমুহূর্তেই সরে আসি;
কী করে পারব আমি? ওরা বড়ো নিপুণ বিলাসী,
পদ্মের উপরে খুব অনায়াসে নগর বসিয়ে

ছড়ায় দেদার দাসদাসী ;
—'তোমাদের কোন রাশি ?' 'মিথুন অথবা মেষরাশি।'

ওরা কি এখন থেকে যে যার বঁধুকে বেছে নেবে ?
ওরা বেছে নেয়, আমাদের মতো সে-খবর ছেপে
পয়সা করে না ;
ওদের বয়স হলে ওরাও কি গ্রাহকের কেনা ?
—'কী হবে তোদের ভালে ?' 'আমরা চলি না ভাগ্য মেপে।'

লুকিয়ে বিবাহ করে, মনে হয়, তবু খুব উদার উঠোনে
শিশুদের শিশু খেলা করে,
পাশাপাশি ভালোবাসে, ভালোবাসা হয়ে গেলে পরে
শীত জড়োসড়ো হয়ে এ ওর শরীর উল বোনে—
—'কোন ঘরে ভালোবাস ?' 'টেনিসের খেলার চত্বরে।'

ওদের সকলি জানি, মনে হয়, কে কেমন শৌখিন শৌখিনা
এক-এক সময় ভাবি সব ফাঁস করে দেব কিনা ;
শেষে খুব দয়া হয়, বিশেষত মাঝরাতে যেই
চেয়ে দেখি বিছানায় আমার ঘরের শিশু নেই,
টেনিসের মাঠে জ্যোৎস্না, মুখ ফুটে কিছুই বলি না।

৯

ধানখেতে এসেছিল বেড়াতে দু-জন,
ধানখেতে শিশু রেখে পালাচ্ছে দু-জন ;

'এবার স্টেশনে চল' বলল একজন ;
'এবার স্টেশনে চল' বলল একজন।

'সাঁকো বেয়ে নিচে এস' এ ওকে বলল,
'সাঁকো বেয়ে নিচে এস' এ ওকে বলল।

আর নেমে এসে ছাখে সুন্দর কাঁথায়
রক্তমাখা শিশু নিয়ে ধানী নৌকো যায়।

১০

দু-তিন সারি নর্তকীর মধ্যে অকস্মাৎ
সেই পুরোহিত এসে
একটি মুখর প্রদীপশিখা নম্র করে হাত
বাড়িয়ে দিলেন শূন্যে ঈষৎ হেসে—

সবার চেয়ে চপলা সেই নটী
প্রশ্ন করে : এখন কত রাত ?
তুমি না অর্ধেন্দু ? চল, মিলেছে কুজ্ঝটি,
পালিয়ে যাবার সুযোগ এল শেষে ॥

১১

ফুটপাতের নিষ্ঠুর সিমেন্টে ঐ কার কার ছায়া জ্যোৎস্নারাতে
মন্দিরার মতো বেজে উঠল।
জয়ন্তী, তোমার ছায়া ? সুহোত্র, তোমার ?
স্থির হয়ে দাঁড়াও, নইলে এখন কিছুই যেন ধরতে পারি না।
যখন রোদ্দুর ছিল এ রাস্তার শিলালিপি পড়তে পারিনি।
জ্যোৎস্নায় এখন খুব শরীরী মানুষও নয় সহজ পাঠের শব্দরূপ,
তবে কেন দয়া করে কয়েক মুহূর্ত স্থির থেকে
আমাকে সাহায্য করছ না!
কে কাকে জড়িয়ে আছ স্পর্শকেই একমাত্র সত্য জেনে নিয়ে,
অথবা সত্যের সমার্থক।
কে কাকে, আজানু হয়ে, ঊর্ধ্ব থেকে ঘন করে নিলে,
কদম্বকেশর ওড়ে সারাটা পথের বারান্দায়
সমাহার করে নিতে ছুটে যাই ততক্ষণে সারাটা রাস্তাই কীর্ণ কদম্বকেশর
মুখ তুললেই আমি বুঝে নিতে পারব কে কেমন,
কার কী-কী নাম, কিন্তু মুখ তোলা দারুণ বারণ,
কারণ এখন শুধু ছায়া থেকে সমগ্রের পাঠোদ্ধার করে
পারমিতা পেতে হবে, আমার উপরে সেই নির্দেশ রয়েছে,
তোমরা আমাকে জান বহুকাল, তোমাদের পাড়ার প্রাচীন কবিয়াল,
তবে কেন যেভাবে দাঁড়িয়ে আছ দাঁড়িয়ে থাকছ না,

থেকে থেকে গোলমাল করে দিচ্ছ, ছায়ার সংঘর্ষে ফুটপাতে
মন্দিরা বাজিয়ে দিলে ভুলভাবে, কিন্তু কেন ছায়ার মধ্যেও
তোমরা ঋজুতা নিয়ে দাঁড়াতে পার না,
তোমাদের ভালোবাসা বাঁচা-মরা সব-কিছু আত্মবিশ্বাসের অভাবেই
মাঝে-মাঝে ওরকম সুন্দরের মুগ্ধতা আনে কি?

১২

তোমার সঙ্গে রক্তোদ্বাহ তারা-জ্বলজ্বল্ রাতে :
পালাতে-দেবে না-ভীলরমণীরা-ঘিরে-ধরা-আলপনা,
ছ-মাস তোমাকে রেখে দেবে ওরা বাকি ছয় মাস আমি,
এই ঠিক ছিল, এমন সময় আমাকে ছ-সাতজন
কী যেন বোঝাল ; সূর্য অথবা চন্দ্র তোমাকে যদি
রেখে দেয় তবে আরো শাড়ি আরো সমাদর পাবে তুমি,
এবং সূর্য অথবা চন্দ্র তাঁদের তাঁবুতে আছে
এই কথা ওরা আমাকে বুঝিয়ে তোমাকে আমার থেকে
ঘাসের মতন নিড়িয়ে নিয়েছে, নিয়ে গেছে, তবু যেই
ভীল সর্দার তারা জেলে দেয় বধির আকাশ ছেয়ে,
মেয়েরা পার্কে বেড়ায়, অথবা প্রেমিকসংঘ চলে
নগরগগনে ছায়াপথসম, ছয়-সাতজন এসে
জিজ্ঞাসা করে : কেমন আছেন, লিখছেন টিখছেন?
চেয়ার এগিয়ে হেসে বলে উঠি : খুব ভালো আছি, খুব…

১৩

ভিজে ঘাসের ভিতর দিয়ে চুলের ফিতে
আমার সঙ্গে খুঁজেছিলে, অতর্কিতে
তৃণের মতো হিন্দু মেয়ে
সূর্য থেকে সিঁদুর নিয়ে
চুল মেলেছ সহধর্মে দীক্ষা নিতে।

ভিজে ঘাসের বাষ্প ছুঁয়ে বারো মিনিট
আমরা দু-জন দাঁড়িয়েছিলাম, যে-পুরোহিত
ব্যেপে ছিলেন সে-ভিজে ঘাস

তিনি ভোরের প্রবাল আকাশ,
শুনিয়েছিলেন পাপিয়াদের কথাসরিৎ

হঠাৎ দেখি রৌদ্রে গলে মোমের ডানা,
একটা পাখি। মুনিয়া না, পাপিয়া না,
ভগবানের নিজের ঈগল
তারো ডানায় যন্ত্র বিকল
ছিঁড়েছে তাই আমার নীলিম সামিয়ানা।

বারো মিনিট বেঁচেছিলাম, কোনো যুগল
পরমায়ুর অন্বেষণে বাঁচে কেবল
মুহূর্তেরও এক-চতুর্থ,
ভগবানও এক মুহূর্ত,
স্বগত-শাদা মেঘে নামল আঁধার বাদল॥

১৪

তরুণীর কাছাকাছি ধরে আছে বড় বেশি তৃপ্ত শামাদান,
ওকে যেন ঈশ্বর কাঁদান,
ঈশ্বর ভীষণ জোরে ওকে যেন টেনে নিয়ে যান

আমরণ-ছেলেমানুষিতে,
শামাদান ভেঙে ফেলে দারুণ নিশীথে
নারীটিকে নেয় যেন বাহুতলে, বুকের নিভৃতে—

তা না হলে প্রৌঢ়ের সম্মান
দিয়ে যেন ওকে ভগবান
সমস্ত পিছনে রেখে ভোরের গগনে নিয়ে যান—

তা না হলে আমি নিজে ভেঙে ফেলব তৃপ্ত শামাদান॥

১৫

সেই পাখি
গাছপালা কালো-কালো পাথরের সঙ্গে দিনশেষে
দৃশ্যকোণ তৈরি করে তুলে ধরেছিল।

সেই পাখি
মুখ দেখাতে এল যেই, বারো বছরের ছেলে যেন,
নষ্ট হয়ে গেল সব।

ক্ষতিপূরণের লোভে
যেদিকেই যাই, সেই কাঙাল পাখির মিথ্যাচার,
নদীর ওপারে যাই সেখানেও নম্র ব্যভিচার পাখিটার
কালো পাথরের কাছে ফিরে এসে পাথরের মতো
বসে থাকি, তখনই সে ট্যুরিস্টের দিকে উড়ে যায়।

১৬

বোবা নয়, তবু একটি কথাও শুনিনি, অথবা
আমিও তো নই বোবা
অথচ একটি কথাও বলিনি, শুধু একবার
শিরীষের ছায়া বেঁকে গেল যেই, গৃহকর্তার
শর্ত না মেনে দু-জনে সেদিকে তাকিয়েছিলাম,
কেউ কি জানেন ও-মহাপাপের যথাযথ নাম ?

১৭

অনিরুদ্ধ অনিরুদ্ধ !
—কে ডাকছ, কে আমায় ডাকছ ?
—আমি তোমার প্রাচীন বন্ধু।
—ওহো সুহাস ? ওরে সুহাস !
তমাল ডালে পল্লবিত মেকন রঙের রোদ্দুর।

—সুহাস তুমি কেমন আছ ?
কৃষ্ণনগর ছাড়লে কবে ?
ন-দশ বছর পরে দেখা,
বয়স ভীষণ বুড়ো বানায় !
তমাল ডালে পল্লবিত মেকন রঙের রোদ্দুর।

—অনিরুদ্ধ, তোমার মেয়ের
বয়স এখন কত, উনিশ ?

—সুহাস, তুমি বলতে পার
মৃত্যুতে কি বয়স বাড়ে ?
তমাল ডালে পল্লবিত মেরুন রঙের রৌদ্দুর।

১৮

সেদিনও তো অপ্রধানা শিক্ষয়িত্রী ছিলে, ধরিত্রীকে
অনৃত রূপক বলে বুঝতে শেখনি, বনশ্রেণী
গুণময়ী এই জেনে বৈধী-রাগানুগা দুই বেণী
কাঁপিয়ে ছাত্রীর মতো চলে যেতে। রাজীনামা লিখে
আমার বন্ধুকে যেই কাছে নিলে, তখনো মেলেনি
এমন খাণ্ডারনি ভাব, সে-বন্ধু অধুনা ভৃত্যাঙ্গিকে
আজ্ঞাবহ ; সুষুম্না ধেয়ায় যথা কুলকুণ্ডলিনী।

বাজারের থলি হাতে অচ্যুত কৃতার্থ মূর্তি তার,
তোমার যখন ক্লাস, স্কুল সেক্রেটারির কুলায়ে
দরবার করতে থাকে, তুমি নিজে গহন মায়ার
প্রকোপ এড়িয়ে ওকে দিলে কোন মহিমা বুলায়ে !
ছাত্রীবৃন্দ তোমাকে জানায় যবে গার্ড অফ্ অনার,
আমার বন্ধুকে দেখি দোলে গদগদ মন্দবায়ে
ঘন ঘন তালি দেয় ভুল জায়গায় বারংবার।

১৯

পড়োশিধরনে হেঁটে যাচ্ছিলাম, শুনতে পেলাম
দরমা বেড়া দেওয়া ঘরে কে কাকে বলছে :
'পূর্ণেন্দু আমাকে তুমি বাগানের মধ্যে নিয়ে চল
পূর্ণেন্দু, চুম্বন দাও আমাকে, সন্তান না দিয়ে।'

২০

মুখের একদিক লুপ্ত, তবু সে-নারীর
অনির্বচনীয় এক অভ্রের প্রাচীর।

২১

আমার বিশ্বাসের উপর ঈষৎ চাপ দিয়ে
গড়ে তুলতে পারি আমি তরুণ তমাল,
সদাগরী ডিঙা, রাত্রি উজিয়ারা, ভীষণ কানাল,
কিংবা কমনীয় পাখি না-ডানা ঝাপটিয়ে ;

বিশ্বাসে আরেকটু চাপ দিয়ে
উষার মনস্বী চক্রবাল
গড়ে তুলতে পারি হয়ত— কিন্তু দু-পা গিয়ে
পাথরের কোণে জ্বালি শালীন মশাল।

না হলে ব্যাঘাত হবে, হাওয়ার হেরুকবজ্রবীণা
বেজে উঠে মহাকেলেঙ্কারি,
পাছে আমি ওঝা বলে রটে যেতে পারি
আমার বিশ্বাস ভেঙে কিছুই করি না

২২

যত নিচেই না লুকাও মণি
পাতার নিচে
চোখের ভিজে
পাতার নিচে
নিবিড় গাছের
পাতার নিচে
তার আগমনী
এক ভিড় হাটে
সারা তল্লাটে
পুরুষের হাতে
নারীর খোঁপাতে
তাকে নিয়ে মাতে
সাধ্বী, কুলটা, বন্ধ্যা, জননী।

২৩

একবুক অমঙ্গল হয়েছিল, কাকদ্বীপ থেকে খুব কাছে
দ্বীপান্তরে একজনও মানুষ না দেখে সারা বুকে
ভয়ানক উৎকণ্ঠা জেগেছিল, বৃক্ষ সারি-সারি
জুগুপ্সা দেখিয়ে আরো অমঙ্গল বাড়িয়ে দিয়েছে…
কোথা থেকে বরাহেরা তিনটি শৃগাল ধার করে
শিবাসংকীর্তন যোগে 'আত্মা নেই' বলে উঠেছিল,
এমন সময় দেখি একটি অনাথ শিশু এসে
গহন হৃদয়-দেশে দারুণ মাদুর পেতে দিল ॥

২৪

বাটিকে-আঁকা আকাশে দিনশেষে
তুমি আমার প্রিয়,
রয়েছে যারা তোমার পরিবেশে
তারাও ঈশ্বরীয় ;
তোমাকে সব দিলাম ভালোবেসে
তুমি ওদের দিয়ো।
বাটিকে-আঁকা তোমার মুখে মেশে
বিষম রাত্রিও ॥

রুদ্রাক্ষের ঋতু

অবরোহী প্রার্থনার মতো

প্রথমে পাখির মতো, পর্বতে-পর্বতে
ঘুরে-ঘুরে যেতে গিয়ে পাখিদের রাজার মতন
হঠাৎ দাঁড়িয়ে-পড়া, কোনো শৃঙ্গে, অতঃপর শুধু
নির্দেশের রাজকীয় মুদ্রা, শুধু সমুখ গাঢ়তা—
আর ঠিক সেইভাবে অবাঙ্মুখ একটি ঈক্ষণে
দয়ার শায়ক দিয়ে বিঁধে নেওয়া পৃথিবী, মানুষ,
নানা ধরনের ফুল, গাছপালা, পতঙ্গ, প্রাকার—
আরেক ভাষায় বলতে গেলে
যেন এক ঐশ্বরিক ছেলেধরা, সকলকে ধরে
পৌঁছে দেওয়া নিজ-নিজ অমোঘ ভূমিতে, কিংবা বাড়িতে-বাড়িতে,
যেন এক শরদংশু-জালিয়াতি, সকলকে ধরে
সেই মানুষের নামে বাজারে চালিয়ে দেওয়া যার
দৌলতে প্রবেশপত্র সকলেই পেয়ে গিয়েছিল·

অগ্নিতুষার

সুখোষ্ণ সুস্বপ্ন গ্যাখে যতেক বদমাশ,
ননীর শয্যায় নিদ্রা যায় ;
কলকাতার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে যখন
প্রেয়ারি-আগুন, পিত্রালয়ে
কোনো-কোনো ননীমাধব ট্র্যানজিস্টর খুলে
অগ্নিসহ মোহন কুলায়ে
নধর আনন্দে থাকে, ঘুম থেকে উঠে
ক্রিকেটের প্রচুর টিকেট পায়।

আমি কিন্তু একজনকে দেখেছিলাম খুব ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছিল ;
এত খারাপ স্বপ্ন যে সে তৃপ্ত বেঁচে আর সকলে মৃত,
এরকম দুঃস্বপ্ন যে তার শরীর শুধু শরীরের প্রণীত ;
ভদ্রকালীর শ্মশানে অগ্নিতুষারে তার শরীর ঢেকে দিল ॥

একা

পাখিটির মাতৃভাষা চেয়ে থাকা,
ত্রিজগৎ রুষ্ট যখন ভ্রূকুঞ্চিত
পাতাহীন শিউলি ডালে একলা-একা
পাখিটির মাতৃভাষা চেয়ে থাকা।

চারিদিক ঘুরিয়ে মরে একই ঘানি
আবেগের অনাবেগের, এমন-কি আজ
বাসনা বাসনা নয়, আশ্লেষেও
নতুনের আস্বাদ নেই, উচ্ছ্ প্রথা,
প্রজনন প্রজাপালন যুদ্ধ এবং
সনাতন যুদ্ধরতি অন্যভাষা ;
পাতাহীন শিউলি গাছের থিরশাখে
পাখিটির মাতৃভাষা চেয়ে থাকা ॥

মাস্তুলতোলা বোট নিয়ে গোরাই সেতুর নিচে রবীন্দ্রনাথ

মাস্তুল সেতুর গায়ে ঠেকে গেল, এদিকে প্রবল
বৃষ্টি, স্রোত ক্রমাগত নৌকো ঠেলছে দ্রুতবেগে,
মাস্তুল মড়্‌মড়্‌ করে ভাঙবার উপক্রম, জল···
লোহার সেতুটা যদি এ-সময় লোহার অটল
ধর্ম ত্যাগ করে, যদি এক ফুট উপরে ওঠে, মাত্র এক ফুট,
অথবা মাস্তুল যদি কাঠের অটুট
ধর্ম ছেড়ে এক ফুট মাথা নিচু করে কিংবা নদী যদি নদীত্বের থেকে
সামান্য স্খলিত হয়ে নৌকোখানা ছেড়ে দেয়, খুব ভালো হয়।

তা হবার জো নেই, লোহা সে তো লোহা,
কাঠ সে-ও কাঠ, জল সে-ও জল, সবাই মন্ময়
নিজ গুণে, বিশেষত্বে, ব্যক্তিবিশেষের কাছে বেঁকে

লোহা কাঠ জল কিংবা তুমি আমি দু-জনার কাছে দোহা
নোয়াবো না খোয়াবো না।   আর তাই লোহা কাঠ জল
জানা চাই, ইন্দ্রিয়বিদারী আখণ্ডল
পৃথিবীকে জানা চাই, তাই শিল্প।   যে-আমি নিজের
গহ্বরে লুকাই মুখ, যে-তুমি চিবুক রাখ পুবদিকে, বুলবুলিদের
আঘাত কর না, শুধু কাছে এলে স্পর্শ কর, ফুল আর ফল
পাতার বিন্যাস আর পাতার বিনাশে অবিরল
নিজের বিনুনি নিয়ে অণোরণীয়ান ব্যস্ততায়
আমাকে জাগাও, তাই প্রেম ; কিন্তু কাল সরে যায়
দু-দিকে বয়স চলে অসম্পন্ন খেজুরের সার,
দু-দিকে বয়স চলে :   আমাদের পথ মাঝখানে,
অন্যান্য অধরে কিংবা বিশিষ্ট বাহুর হীনযানে
রুক্ষ আমাদের পথ, যা প্রেম তাই তো শিল্প, আর
জীবন সেখানে।   শীর্ণ এ জীবনে মাত্র কয়বার
স্পর্শ কোরো কাছে এলে কুমারী সিঁথির অভিমানে॥

পূর্বাভাস

কেউ আমাকে বলে দেয়নি,
আমার গভীর ঝাউ-সেনানী
আমার সরল সন্ধ্যাতারা
সে-ও বলেনি, ছন্নছাড়া
স্বার্থশূন্য পাড়ার ছেলে
যে শুধু দেয় রক্ত ঢেলে
সে-ও বোঝেনি, বুঝলে ঠিকই
আমায় বলত, জোড়াদিঘি
জল সরিয়ে দৈববাণী
করত জানি, ঝাউ-সেনানী
স্বচ্ছতায়ার বর্শা তুলে

জানান দিত, বাউণ্ডুলে
পাড়ার ছেলে নিশান তুলে
জানান দিত খবর জানলে
চোখের জলের হোমানলে ,
আমিই শুধু বোবার মতো
আমার বুকের উরঃক্ষত
পরখ করে জেনেছিলাম
তোমার মহান মুখের সুঠাম
কলস নিয়ে পথের উপর
নেমে আসবে, আমি উপুড়
সায়রঝুরি পথের মতো
পড়েছিলাম, মাথা নত ,
কিন্তু তুমি সবার কাছে
আমার নিবেদনের কথা
শুনেছিলে ঝাউয়ের গাছে,
পাড়াতুতো ভাইয়ের কাছে ,
অভদ্রতা অভদ্রতা
বলতে বলতে তুমি হঠাৎ
বেঁকে গেলে শাঁখের করাত
চালিয়ে দিয়ে গেলে বেঁকে
অমানুষিক অশ্বমেধে।

যুবসমাজের কাছে প্রার্থনা

আমি দীনবন্ধু বলে ডাকব ঐ বুড়ো লোকটিকে,
তোমরা কেউ নিষেধ কোরো না।
আমি সূর্য দেখলাম ক্লিষ্ট ঐ বুড়ো লোকটিতে,
তোমরা আমার আস্থা নষ্ট কোরো না

ফুটপাতে উদ্ভাসিত, বাহিরে জ্যোতিশ্চক্র নেই ;
তিনি কালীঘাট থেকে পার্ক সার্কাসের দিকে যেতে
পথ ভুল করেছেন, ডবল ডেকার ধরতে গিয়ে
নিজেই নিজের মনে হেসে উঠেছেন। তারপরে

কোনোই ঘটনা নেই, শুধু এক উপলক্ষ তিনি,
অনাত্মচেতন, হাতে বস্তুত বিষয় নেই কোনো,
অক্ষৌহিনীর মধ্যে তিনি এক পরিচ্ছন্ন স্বখ
অন্তর্লোকেই শান্তি ; আচার্য বলতে পারি ওঁকে।

আমি দীনবন্ধু বলে ডাকব ঐ বুড়ো লোকটিকে,
তোমরা কেউ ব্যাঘাত কোরো না,
আমি ওঁকে চন্দনের তিলক পরাব, পূর্বাচলে ;
তার আগে ওঁকে তোমরা হত্যা কোরো না ॥

অভাবশোভা

ও গেল যখন, পড়োশি মাঠের একটিও ঘন ঘাস
কোনো শিশিরের আর্শিতে তার মুখ
দেখতে যায়নি, ঝাউয়ের খোপায় অজস্র বিশ্বাস,
ঝর্নার জল সরল, অকৌতুক।

কেউ কি কখনো যেতে পারে এই বাহিরের ঘরদোর
উপেক্ষা করে, কারো বুঝি কৈশোর
ভেসে যেতে পারে ? পাহাড়ের বাহুযুগ
ঘুমের ভিতরে বুঝতে চায়নি কিশোরের সন্ন্যাস।

ও যখন গেল, পোড়ো মন্দির থেকে
বাঁকা পথ সেই আগের মতোই বেঁকে
চুম্বন নিতে চলে গেল তার পাহাড়ি নদীর কাছে।
দু-ধারে গোরুর গলার ঘণ্টা জলতরঙ্গে বাজে ॥

একটি মৃত্যু

ওলো তোরা দেখেছিস অষ্টমীর চাঁদ ?
বলতে-বলতে নষ্ট মেয়ে ছুটে-ছুটে পড়ে
এর ঘরে ওর ঘরে যার-তার ঘরে
এর-ওর পেশাদার হৃদের আহ্লাদ
ভেঙে-চুরে এর-ওর খলপ্রপাত
একাকার কেয়াখয়ের পানসুপুরি অসংলগ্ন হাত
সবসুদ্ধ গোটা সমুদ্রটা নিয়ে সে আমার ঘরে
ঢুকে পড়ে দোর বন্ধ করে ;
অধোভুবনের জন্য চন্দ্র চায় কুমারী-অনাথ ?
তৎক্ষণাৎ ওরা ওকে ফেলে দিল স্বখাত সাগরে ॥

অঙ্কুশ

বাড়ির নাম 'ম্যাগ্নোলিয়া ভিলা',
যশিডি কাছে। স্বাস্থ্যপরিবর্তন অছিলা,
কেননা তুমি দু-মাস সিঁথিসিঁদুর মুছে ফেলে
আমার কাছে এসেছিলে।
আমি আমার টিলা
ছেড়ে কিন্তু যাইনি তোমার ডেরা
কোনোদিনও, পুরুষ পুরুষ মহিলা মহিলা
এই বোধে নয়, তোমার বাড়ি গেলেই লেজচেরা
ডাইনি-ফিঙে আটক করে দেবে
ভেবে
আমি আমার টিলায় ছিলাম।
তুমি আমার প্রতি
অতর্কিতে দারুণ দয়াবতী
এসে বললে 'আমি তোমার অধীনা, চল নদী

দেখাবে চল, আমাকে' আর আমি তোমায় নদী
দেখাতে গেছি তুমি আমায় 'এ তো সবরমতী
আশ্রমিক নদীটি নয়' বলেই আরো নিহিত পদ্ধতি
শেখাবে বলে ত্রিপদী ঠামে তোমার দেহমনে
সন্ধ্যাভাষা রটিয়ে দিলে, তোমার নিকেতনে
যেতেই হল—
কাছে যেতেই সুশিক্ষিত দ্বারী
সেলাম ঠুকে : 'এবার যেতে পারি ?'

মধ্যরাত। 'আর কী পেতে চাস'
বলতে গিয়ে পুনর্বার মেচুর অধ্যাস
পরিগ্রহ করি।
মধ্যরাত, তামসী শর্বরী।
চার দেয়ালের কোণে কোণে দেওয়ানদের মৃত
শাণিত তরবারি
রাংতা-সম অর্থহীন। রায় বাহাদুরের
প্রতিকৃতি, নিহত বাঘে পা রেখে সুস্থিত,
সেটা যে কত হাস্যকর, প্রমাণ করতে গিয়ে
দস্যু ভীল সর্দারের অনুকরণ করি।

হঠাৎ দেখি বিদ্যুতের অঙ্কুশ চালিয়ে
দরজা দেয়াল ফেড়ে ফেলে তীব্র অট্টহেসে
ঘরের মধ্যে চিঠি পড়ল, তৈমুরের সেনাসৈন্য যদি
বর্শাফলায় ছিন্নমুণ্ড বহন করত তবে
এর চেয়েও কি ভীষণ দুর্গতি
হত আমার ? আর্ত কেঁদে উঠে
ছিটকে তুমি পালিয়ে গেলে। ছিঁড়তে গিয়ে দেখি
আমায় টুকরো করে ছেঁড়ে তোমার গোপন শিশুর লেখা চিঠি

ছয় ঋতু ছত্রিশ রাগিণী

আকাশ আর আমার মধ্যে
কোনো বাধা আমি আর গণ্যই করি না ,
জানলা বুজিয়ে দিয়ে কিংবা খুলে রেখে
দরোজা ভেজিয়ে কিংবা অনর্গল করে দিয়ে
তোমাকে সরিয়ে রেখে অথবা বুকের ঘরোয়া-সবুজ বরজে নিয়ে
নিসর্গের দাসত্বে একভিড় বৃক্ষপর্ণের সৌজন্যে
বন্ধুহীন মধ্যাহ্নের মরুবারান্দায়
নিরালা ভোরের লাজুক-সপ্রতিভ রাজপথে বীরধ্বজ রথের আভিজাত্যের প্রভাবে
তারকেশ্বর শ্রাবণী-মেলার মানৎ-মথিত চিৎকারে
অবস্থার অনিশ্চয় ওঠা-নামার মধ্য দিয়ে ধাতস্থ পারদের পুতুলের মতো
একজন ভীষণ বুড়ো লোক আমার শরীরের অর্ধেকটা
আকাশের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে
একপাত্র পারদের মধ্যে সূর্য-ওঠা
সূর্যাস্ত
চন্দ্রোদয় আর
অমাবস্যার
রং-বদল দেখাচ্ছে

কনার জন্য শীতের কবিতা

বয়সোচিত
শীত

এল আমার
আর

তোমার পাশে
হাসে

কী সুন্দর
ঘর ;

ঘর ছেয়েছে
মেঝে

আর কিছু না,
ঝুনা,

শেষ প্রহরে
ঘরে

উপকরণ
মন ॥

তারা দেবী, তোমার মন্দিরে

তারা দেবী, তোমার মন্দির কেন অত তীব্র উদারায় বেঁধেছ ?
তোমার মন্দির কোন জৈন দেবতার তানপুরা ?
পরক্ষণে, উত্তর শুনতে না পেয়ে, দেখি খুব তুষার জমেছে
চত্বরে, তুষারে খুব ধাতুমূর্তি ঢেকে দিতে জানে,
তুষারে তোমার মুখ সুলতার মতন দেখাল।

সুলতাকে বললাম
'এস একেবারে নেমে পড়া যাক :
ধস
যেমন গভীর পরবশ ;
স্কি করে, বেঘোরে, কিংবা কুইজ খেলতে খেলতে
নতজানু অথবা আনাক-
রথবর্ত্ম ঢালু করে ঈগল বা কাক

যে-রকম সরাসরি ঢুকে যায় ঈথারের স্রোতে,
আমাকে জড়িয়ে ধরে চল যাই অবরোহ-ব্রতে'

সুলতা আমার কথা বিশ্বাস করে না।

কথাটা আরেকবার সুলতার কানে
সন্ধ্যায় তুলব এই ভেবে
বাগানের শৌখিন সংরক্ত ফুলগুলি
নখের নিখাদে ছুঁই, ওরা কেঁপে কেঁপে
ভদ্রতা দেখাতে গিয়ে নিরংশুক নাচে
মেতে ওঠে, আমি প্রত্যাহার করি স্পর্শক অঙ্গুলি।

আমি কি ইন্দ্রিয়গুলি তোমায় গচ্ছিত রেখে যাব?
পাঁচজন-ছজন ওরা আমাকে নানান দিগ্বিদিকে
নিয়ে গিয়েছিল নানা বহির্জীবনের অনুষ্ঠানে.
এখনো, পুরনো বন্ধু যেইমতো, ওরা খুব জানে
কী করে জুড়োনো যায় ক্ষতচিহ্ন, কী করে রুদ্রাক্ষ
আগুন জ্বালান যায় মাঘ যবে ছায় পৃথিবীকে।

এইবারে সুলতাকে বলা যায় কিনা
ভেবে দেখি, তারা দেবী, তোমার চেয়েও
স্থৈর্য আছে সুলতার, আছে পরিমেয়
নির্বেদ, তথাপি সুলতা তারা দেবী না,
যদিও আমাকে খুব সুযোগ দিয়েছে সুদক্ষিণা—
আমি যদি কথা বলি, দেহ
ধরে সে দাঁড়িয়ে থাকে, তবুও সে নয় মনোহীনা

অথচ বলতে গেলে আরো স্বাভাবিক হতে হবে,
অস্ত্যমিল ছুঁড়ে ফেলি উন্মত্ত গহ্বরে গহ্বরে,
সমস্ত গহ্বর থেকে কারা যেন হা-হা হেসে উঠে
অস্ত্যমিল ফিরিয়ে দেয়, আমি স্যুটকেশ খুলে দাক্ষিণাত্য থেকে নিয়ে আসা
ব্রোঞ্জের নটরাজের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ি, সম্মেলক একটি ধিক্কারে
মূর্তি ফেটে যায়, আমি সুলতা কোথায় বলে ঝাঁপ দিতে চাই চরাচরে।

'সুলতা, তোমাকে কাছে পেলে
বলা যেত, আমার বক্তব্য
অত্যন্ত বিশদ, ঐ গহ্বরে গহ্বরে
মানবসংসার আছে, পুঞ্জ পুঞ্জ প্রাণ
আলোকমালার মতো জ্বলছে দেখছ ?
আমরা তাহলে কেন কিন্নরের মতো
ঝুলে থাকি মধ্যলোকে ? আমাদের সকল সুকৃতি
এইখানে থেমে গেছে, মন্দিরের ওদিকে যাওয়া যাবে না আর,
বরঞ্চ ওখানে চল নামা যাক।'

সুলতা আমার কথা বিশ্বাস করে না।

'তুমি আগে শিখরিণীদের দলে ছিলে,
অণিমা সেনগুপ্ত যেবার কী-একটা শিবির থেকে প্রাণ হারালেন
তুমি সেই দলে ছিলে। ফিরে এলে যেদিন, তোমাকে
সংঘ থেকে ছিঁড়ে নিলাম গোষ্ঠী থেকে তুলে নিলাম
চার দেয়ালে বেঁধে নিলাম ; তোমাকে খুব জীবনে যেতে দিলে
তুমি আরো মৃত্যুর অধীন হবে, এই ভেবে তোমাকে আমি এমন-কি কখনো
পর্বতভ্রমণ বিষয়ে লেখা নাটকে মহড়ায় অংশ নিতে অনুমতি দিইনি ;
তুমি যেন আমার বাড়িতে চৌদিকে মালঞ্চের বেড়ায়
ভালো থাক, তুমি যেন মণ্ডলে অঙ্কিত থাক—
এবার, বিয়ের অন্তত ছ' বছর পর আমরা বেড়াতে এসেছি
হিল-স্টেশনে, তোমার তো এর আগে ওঠা-নামার অভ্যাস ছিলই,
তুমি কেন আমার হাত ধরেও নামতে পারছ না ঐ মানবসংসারে।'

সুলতা নিষ্পন্দ চেয়ে থাকে।

'তাড়াতাড়ি চল নেমে পড়া যাক,
ধর্ষকামুক ধস
যেমন উরগ, গহ্বরপরবশ,
স্কি করে, বেঘোরে, কুইজ খেলতে খেলতে,

আজানু অনেকে
রথবর্ত্মের দর্প নিভিয়ে ঈগল বা কাক
হঠাৎ যেমন সরাসরি যায় উৎখাতের স্রোতে
আমাকে জড়িয়ে ধর, চল যাই অবরোহ-ব্রতে।'

যত বলি, নিজের কানেই
দারুণ বেখাপ্পা লাগে, ঘন মাত্রাবৃত্তে কিংবা দীর্ঘ কবিতার মতো ছেদ টেনে-টেনে
যত বলি, কোনো মানে নেই
মনে হয়, তারা দেবী, তোমার উঁচু মন্দিরেও কথা নেই জেনে
লজ্জায় আমার খুব ঘৃণা করে, স্থূলতাকে কথা বলতেও ঘৃণা করে,
কেননা, কোনোভাবেই একজনের অভীপ্সা কখনো
আরেকজনের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে না, জানানো
যাবে না, এখন শুধু জেনে-নেওয়া। তাহলে গহ্বরে
নিজে নেমে গিয়ে দেখা যাক॥

শ্রমণ

তবে আমার এখন থেকে জেগে-থাকার আমৃত্যু-ভূমিকা—
নিসর্গের যেমন জাগরণ
সন্তাপের ভিতরে জলে শ্রাবণী মেলার ধারায় ভিজে
মাঘের তুষারতুষানলে জলে-ভিজে
যাত্রাকাল, সারা জীবন,
যেন একাই অনেক হয়ে যোজন-যোজন চলতে থাকা,
আকাঙ্ক্ষা যেই বিভক্ত হয় অমনি ভীষণ অনাসক্ত
পাংশু মোমের মিছিল থেকে অতর্কিতে শিখাসংঘ
প্রতিষ্ঠিত আকাশ ব্যেপে ;
রুক্ষ-রিক্ত ভিখারিদের জড়ো-করা শুকনো পাতায়
হিরণ্যহোম :
ভিখারিদের মধ্যে থেকে ফেরা যেমন বাতুলতা,

ফিরিয়ে নিতে এল আমার প্রিয়জনতা, তবুও আমি
কী-নির্বোধ, জন্মাব না জন্মাব না বলতে-বলতে
মাত্রা ভুলে আলোর কেন্দ্রে টলতে থাকি,
যেন একবার আলো জ্বাললে আলোর দলে নাম লেখালে
কিছুতে আর ফেরা যায় না—বলে আমার বোনের হাতে
ফিরিয়ে দিই হলদে পাখি ॥
